শাশ্বত প্রেমের কাহিনী

# দময়ন্তী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



দ ম য় ন্তী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

# দময়ন্তী





মঘপত্র প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ, ১৩৭৮

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৯

মুদ্রক ঃ নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ শৈল চক্রবর্তী

দাম ঃ **দশ টাকা**

DAMAYANTI
by
SUNIL GANGAPADHYAY



রাজকুমার পুষ্কর তাঁর অনুচর ও বন্ধুদের নিয়ে শিকারে বেরিয়েছেন।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ, বাতাসে ঈষৎ শীতের স্পর্শ লেগেছে, সকাল ও অপরাহ্ণের রোদ এখন বড় মোলায়েম লাগে। আকাশের রং ক্রমশ গাঢ় নীল হয়ে এসেছে, কোথাও কোথাও ভ্রাম্যমান সাদা তুলো তুলো মেঘ।

রাজকুমার পুষ্কর অতিশয় শিকার-প্রিয়। বিনা কারণে পশু হত্যা করে তিনি আমোদ পান। একদিনে শতাধিক প্রাণী হত্যা করেও তাঁর তৃপ্তি হয় না।

বনে উন্মত্তবৎ ছুটে বেড়ান তিনি। দিনের আলো সম্পূর্ণ নিভে গেলে রক্তাক্ত শরীরে ফিরে আসেন রাজপ্রাসাদে।

শিকার করা ছাড়া সারাদিনে রাজকুমার পুষ্করের আর কোন কাজ নেই। তাঁর বয়েস চব্বিশ, সুন্দর স্বাস্থ্যবান শরীর, মন চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্যের জায়গায় এখন স্থান নিয়েছে দারুণ এক জ্বালা। ক্রোধ, হিংসা, দুঃখ মিলে এক আগুন নিরন্তর তাঁর বুকের মধ্যে জ্বলছে। সেই জ্বালা ভুলবার জন্যই তিনি দিনের বেলা পশু-শিকার আর সন্ধ্যার পর অক্ষক্রীড়ায় মেতে থাকেন।

দু'বছর আগে পুষ্করের পিতৃবিয়োগ হয়েছে। তিনি আশা করেছিলেন যে রাজা বীরসেন মৃত্যুকালে তাঁর রাজ্য দু'ভাগে ভাগ করে দিয়ে যাবেন। কিন্তু তা তিনি করেননি, ভাগাভাগি করলে রাজশক্তি দুর্বল হয়ে যায় এই যুক্তিতে তিনি সম্পূর্ণ রাজ্যটিই দিয়ে গেছেন পুষ্করের বৈমাত্রেয় ভাইকে। দুই ভাই প্রায় সমান বয়সী, পুষ্কর সামান্য একটু ছোট, শুধু সেই অপরাধেই তিনি রাজা হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন। লোকে তাকে রাজকুমার বলে বটে, কিন্তু বর্তমানে তিনি একজন বৃত্তিভোগী কৃপাপাত্র মাত্র, রাজ্যশাসনের কোন ক্ষমতাই তাঁকে দেওয়া হয়নি।

শীতের শুরুতে মানস সরোবর থেকে হংসের দল উড়ে আসে এদিকে। বিশাল ডানাযুক্ত সুন্দর শ্বেত হংসের এক একটি ঝাঁক আকাশের বুকে মালার মতন দোলে। হরিণ-শূকর শিকারে অরুচি ধরে যাওয়ায় যুবরাজ পুষ্কর এখন হংস শিকারে মেতেছেন। ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে তিনি ধ্বংস করতে লাগলেন হংসকুল।

খুব বড় একটি হংস তীরের ঘায়ে আহত হয়ে শূন্য থেকে ঘুরতে ঘুরতে পড়তে লাগল নিচে। রাজকুমার পুষ্কর সেই হংসটিকে অনুসরণ করতে করতে ছুটতে লাগলেন। হংসটি এসে পড়ল রাজবাড়ীর উদ্যানে। রাজকুমার পুষ্কর সেখানে এসে পৌঁছবার আগেই তাঁর দাদা রাজা নল হংসটিকে ধরে ফেললেন। সারাদিনের রাজকার্যের পর রাজা নল সেই সময় উদ্যানে পরিভ্রমণ করে চিত্ত-বিনোদন করছিলেন, এমন সময় তাঁর সামনেই একটি মাধবীলতার কুঞ্জে ঝপ করে এসে পড়ে মরালটি।

রাজা নল হংসটির রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তার শরীর থেকে তীরটি তুলে ফেললেন। ক্ষত খুব বেশী নয়, সেবা যত্ন করলে হংসটি বেঁচে যেতে পারে।

এই সময় রাজকুমার পুষ্কর ছুটতে ছুটতে উপস্থিত হলেন সেখানে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতেও চান না পুষ্কর। তিনি মুখ

গোঁজ করে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, ঐ হংসটি আমার !

রাজা নল বললেন, ভাই, আমি সংবাদ পেয়েছি যে ইতিমধ্যেই তুমি সহস্রাধিক হংস বধ করেছ, তাতেও কি তোমার আশ মেটেনি ? এই মরালটি আমি নিলাম।

রাজকুমার পুষ্কর বললেন, আপনার যদি হংসের প্রয়োজন থাকে, আপনি নিজে ধনুর্বাণ নিয়ে শিকার করুন, কিংবা লোকজনকে আদেশ করুন, তারা জাল ফেলে আপনার যে-কটি প্রয়োজন ধরে দেবে। আপনি আমারটি নিচ্ছেন কেন ? এটার ওপর আমারই ন্যায্য অধিকার।

নল বললেন, আমি আর কোন হংস চাই না, আমি এটাকেই বাঁচিয়ে তুলতে চাই।

পুষ্কর তবু হাত বাড়িয়ে বললেন, প্রথম যে অস্ত্র নিক্ষেপ করে নিহত বা আহত শিকারের ওপর অধিকার থাকে তারই। সুতরাং ঐ হংস আমারই প্রাপ্য। দিন !

এ যেন সিদ্ধার্থ দেবদত্ত উপখ্যানেরই আর একটি রূপ।

ভাইয়ের উদ্ধত বাক্য শুনে রাজা নল স্থির ভাবে তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তুমি এক কাজ কর তো, মন্ত্রী মাধব্যকে ডেকে আন। আমি এখনি সারা রাজ্যে প্রচার করতে চাই যে আজ থেকে নিষধ দেশে হংস শিকার নিষিদ্ধ হল। মানস সরোবরের এই মরালগুলি আমাদের দেশের অতিথি, এদের কেউ বধ করলে কঠোর শাস্তি পাবে।

অবরুদ্ধ ক্রোধ বক্ষে নিয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে গেলেন পুষ্কর।

রাজা নল আহত হংসটিকে সেবা শুশ্রূষা দিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলার জন্য মনোনিবেশ করলেন।

তখন সেই হংস মানুষের কণ্ঠে কথা বলে উঠল। সে বলল, হে রাজন, আমি অনেক দেশ ঘুরেছি, কিন্তু কোন হংসের প্রাণ বাঁচানোর জন্য কোন রাজ-পুরুষকে কখনো তৎপর হতে দেখিনি। আপনি ধন্য। আমি আপনার এই উপকারের প্রতিদান দিতে চাই।

রাজা নল হেসে বললেন, হে মরালশ্রেষ্ঠ, আমি তো কোন প্রতিদানের আশায় তোমার প্রাণ বাঁচাইনি।

হংসটি বলল, আপনি প্রতিদানের আশা করেননি তো বটেই, তবু আপনার কাছে আমি এবং সমস্ত হংসকুল কৃতজ্ঞতায় ঋণী। আমরা আকাশচারী, আমরা কোন ঋণের বন্ধন রাখতে চাই না, সেইজন্যই আপনাকে প্রতিদান দিতে চাই।

রাজা বললেন, তুমি আমায় কী প্রতিদান দেবে ?

হংস বলল, আমরা অতি সামান্য প্রাণী হলেও আমরা দেশ-বিদেশে বিচরণ করি। এমন অনেক সংবাদ আমরা জানি, যা আপনাদেরও অগোচর। হে মহারাজ, আপনি রূপে কন্দর্পের সমান, গুণে দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়র তুল্য, আপনার হৃদয় সমুদ্রের মতন বিশাল, কিন্তু আপনি এখনো অকৃতদার। আপনার সুযোগ্য সহধর্মিনী কে হতে পারে, সে সন্ধান দিতে পারি আমরাই। আমি সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছি, কত রকম নারী-পুরুষ দেখেছি, এই বিশাল দেশটিতে দীর্ঘকায়, খর্বকায়, গৌরবর্ণ, পীতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ কতরকম মানুষই না আছে। কিন্তু এক সদ্য যুবতীকে দেখেছি, তার কোন তুলনাই হয় না। প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল সে মানবী নয়, কোন স্বর্গচ্যুতা দেবী। পরে বুঝলাম, না সে মানবীই বটে। শত শত দাসী ও সখী পরিবৃতা অবস্থায় তাকে মনে হচ্ছিল যেন কাদম্বিনীর মধ্যে সৌদামিনী। হে রাজন, সেই রমণীই আপনার উপযুক্ত পত্নী হতে পারেন। আমি আপনাকে তার সন্ধান এনে দিতে পারি।

রাজা এবার সকৌতুকে বললেন, তাই নাকি! তা সে কোন দেশের কামিনী? তার বংশ পরিচয় কী? আরও একটু বল তো, শুনি!

হংস বলল, তাঁকে ঠিক কোন্ দেশে দেখেছি, তা ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। তবে আকাশপথ চিনে আমি সেখানে আবার পেঁছোতে পারবো ঠিকই। সেই রূপসী-শ্রেষ্ঠার কাছে আমি এমন ভাবে আপনার গুণানুবাদ করব যে তিনি আপনার প্রতি অনুরক্ত হবেনই। তারপর আমি আবার ফিরে এসে আপনাকে তার মনোবাসনা জানিয়ে যাব।

রাজা বললেন, অর্থাৎ তুমি আমার বিবাহের দূতিয়ালি করতে চাও! এ বড় অভিনব প্রস্তাব তো! আচ্ছা, দেখা যাক, তুমি কতদূর কৃতকার্য হতে পারো!

সেই রাত্রি রাজপ্রাসাদে কাটিয়ে পরদিন প্রভাতে মানস-হংস উড়ে গেল আকাশে।

ক্রমে একাকী সেই হংস এসে পেঁছল বিদর্ভ দেশে। এই দেশটি বড় সুন্দর। রাজার সুশাসনে এ দেশের প্রজাগণ সুখ ও শান্তিতে দিন কাটায়। এ দেশের ভূমি শষ্যশ্যামল, অরণ্যের বৃক্ষগুলি ফলবান, নদীসমূহ সুমিষ্ট জল প্রবাহিনী। এই বিদর্ভের রাজপ্রাসাদের কাননে বকুল বৃক্ষের ওপরে এসে হংসটি বসল।

একটু পরে সে দেশের রাজকুমারীর সখীরা পুষ্পচয়ন করার জন্য উদ্যানে



এসে সেই মনোহর হংসটিকে দেখে কলরব করে উঠল। সকলেই তাকে ধরতে চায়। বকুল বৃক্ষটি তেমন উচ্চ নয়, কয়েকজন সখী চেষ্টা করল তাতে আরোহণ করতে, কয়েকজন লাফিয়ে লাফিয়ে সেই বৃক্ষের শাখা ধরে নোয়াতে গেল। হংসটিও তাদের সঙ্গে ক্রীড়া করবার জন্য একবার এই গাছে আরেকবার অন্য গাছে গিয়ে বসতে লাগল।

কোলাহল শুনে আকৃষ্ট হয়ে রাজকুমারী দময়ন্তী চলে এলেন উদ্যানে।

হংসটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি বললেন, ও মা, কী সুন্দর, তোরা আমাকে এই হংসটি ধরে দে তো !

সেই কথা শুনে হংসটি রাজকুমারীর মাথার ওপর চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে বলল, হে রাজকুমারী, আমাকে বন্দী করার প্রয়োজন নেই। আমি স্বেচ্ছায় আপনার কাছেই এসেছি।

হংসের মুখে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে সকলেই বিষম অবাক হয়ে গেল। সখীগণ তাদের আয়ত নেত্র বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইল হংসটির দিকে।

তখন সেই হংস রাজকুমারীর নিকটবর্তী একটি পুষ্পধন্য অশোকবৃক্ষে বসে বলল, হে রাজকুমারী, আপনার সঙ্গে আমার কিছু গূঢ় কথা আছে, আপনার সখীদের একটু অন্তরালে যেতে বলুন।

সখীরা সে কথা শুনে সকলেই আপত্তি করে উঠল। কেউ কেউ ভয় পেল। তারা ভাবল, এ নিশ্চয়ই হংসের ছদ্মবেশে কোন অপদেবতা, এর কাছে রাজকুমারীকে একা রেখে যাওয়া তো নিরাপদ নয়ই, বরং এখুনি প্রতিহারীদের ডাকা উচিত।

কিন্তু রাজকুমারী দময়ন্তী সহজে ভয় পান না। তিনি সখীদের বললেন, না, তোরা যা, এই হংস কি বলতে চায় আমি শুনব।

সকলে অপসৃত হলে হংসটি বলল, হে বরবর্ণিনী, আমি এক পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, রূপে গুণে দেবতুল্য তরুণ রাজার দূত হয়ে আপনার কাছে এসেছি।

নদীর বাঁকের মতন সুচারু ভুরু দুটি উত্তোলন করে দময়ন্তী জিজ্ঞেস করলেন, কে তিনি ?

হংস বলল, তিনি নিষধদেশের অধিপতি নল।

এই নাম শোনামাত্র দময়ন্তী "ওঃ" শব্দ করে দু' হাতে বক্ষ চেপে ধরলেন। শ্বেত কমলের মতন মুখকান্তি রক্তকমলের রূপ ধারণ করল। তিনি সহসা এমনই বিস্মিত হলেন যে একটুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলেন না।

রাজা নলের নাম দময়ন্তীর কাছে মোটেই অপরিচিত নয়। বস্তুত কয়েক মাস ধরে অনেকেই নানান্ প্রসঙ্গে নলের নামে গুণকীর্তন করেছে দময়ন্তীর সামনে। যে সব বনিক ও পরিব্রাজকরা নানা দেশ পর্যটন করে, তারাও ফিরে এসে তাদের স্ত্রীদের কাছে বলে, সমগ্র ভারতে এখন নলের মতন সুপুরুষও সর্বগুণান্বিত রাজা আর একজনও নেই। সেই স্ত্রীরা এই কথা জানায় অন্য নারীদের। এই ভাবে দময়ন্তীর সখীরাও জেনে যায়।

নিষধ দেশ বহু দূরে। রাজা নলকে দময়ন্তী কখনো চক্ষে না দেখলেও

মনে মনে তাঁর একটা মূর্তি গড়ে নিয়ে তাঁকেই প্রিয়তমের আসনে বসিয়েছেন। প্রায়ই নির্জনে তিনি নলের সেই মূর্তি ধ্যান করেন এবং নিঃশব্দে কথা বলেন। এখন হঠাৎ এক হংসের মুখে তিনি শুনলেন সেই নলের কথা।

দময়ন্তীকে নীরব দেখে হংসটি তার আগমনের কারণটি দ্বিতীয়বার ব্যক্ত করল।

তখন দময়ন্তী বললেন, বল, বল হে মরালবর, সেই রাজার কথা বল! তুমি তাঁকে দেখেছ? তিনি কি আমার কথা জানেন?

হংস বলল, হে মানময়ী, খেচরদের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে দূর দূর স্থানে গমন করি। আমরা দেব, গন্ধর্ব, মনুষ্য, রাক্ষস, কপি প্রভৃতি সকলের দেশেই দেখেছি, কিন্তু নলের তুল্য পুরুষ আর একজনও আমি দেখিনি।

দময়ন্তী বললেন, তুমি বললে এ কথা? তুমি নিশ্চয়ই মিথ্যা বলবে না। কারণ মনুষ্য জাতিই শুধু মিথ্যা বলে।

হংস বলল, যেমন এ কথা আপনাকে বললাম, তেমন ঠিক এই প্রকার কথাই রাজা নলকে বলেছি। অর্থাৎ, এত দেশ ঘুরেও আমি আপনার মতন রূপবতী দেখিনি। এখন আপনাদের দুজনের মিলন হলেই নিয়তি দেবী ধন্য হবেন।

দময়ন্তী বললেন, কিন্তু কেমন করে তা হবে? তিনি থাকেন কোথায় আর আমি কোথায়। তিনি কেমন করেই বা আমার কথা জানবেন!

হংস বলল, আপনার কথা আমার কাছ থেকে শুনে তিনি আপনার সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়েছেন, তাঁর চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন্ দেশে থাকে এই কন্যা? এখন আপনি কোন বার্তা পাঠাতে চাইলে তা আমি রাজা নলের কর্ণগোচর করে আসতে পারি।

দময়ন্তী এগিয়ে গিয়ে-হংসটির দুগ্ধধবল ডানায় তাঁর নবনীত সদৃশ কোমল হাত রেখে বললেন, মরালশ্রেষ্ঠ, তোমায় আমি কী উপহার দেব বল তো? তোমার মাথায় কনক মুকুট পরিয়ে দিলে তুমি সুখী হবে?

হংস বলল, হে রাজকুমারী, এই যে আপনি আমায় স্পর্শ করলেন, এতেই কৃতার্থ হয়েছি। আমার আর কিছুই চাই না।

এরপর অনেকক্ষণ ধরে রাজকুমারী দময়ন্তী তাঁর মনের কথা বললেন হংসটিকে।

॥ দুই ॥

বিদর্ভ দেশের রাজার নাম ভীম। দমন নামে মহাতেজা এক ঋষির বরে তিনি তিনটি পুত্র ও এক কন্যা লাভ করেছিলেন। দময়ন্তী তাঁর একমাত্র কন্যা বলেই বিশেষ আদরিণী। দময়ন্তী যৌবনে উপনীত হয়েছেন, এখন কন্যার বিবাহের জন্য রাজা ভীম বিশেষ চিন্তিত। দময়ন্তীর উপযুক্ত পাত্র পাওয়া সহজ কথা নয়। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর মহিষী ও পাত্র-মিত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্বয়ংবর সভা আহ্বান করাই ঠিক করলেন।

দময়ন্তীর রূপ লাবণ্যের খ্যাতি ইতিমধ্যে বহু দূরে বিস্তৃত হয়েছে। তাঁর স্বয়ংবরের কথা শুনে বিভিন্ন দেশের রাজাদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। গুজরাট থেকে কম্বোজ, কান্দাহার থেকে জম্বুদ্বীপ পর্যন্ত রাজারা বেরিয়ে পড়লেন বিদর্ভ দেশের উদ্দেশে।

যথা সময়ে এই স্বয়ংবর সভার কথা রাজা নলেরও কানে এলো। ইতিমধ্যে সেই হংসটি ফিরে এসে নলকে শুনিয়ে গেছে সংকেত বার্তা। সুতরাং হৃষ্টমনে রাজা নল চতুর্বাহিনী সাজিয়ে যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং মন্ত্রী মাধব্যকে ডেকে বললেন, মহামন্ত্রী, আমি কিছুদিনের জন্য বিদর্ভ দেশে যাচ্ছি, যতদিন না ফিরে আসি, ততদিন রাজ্য শাসনের ভার আপনার ওপর রইল।

মন্ত্রী ঈষৎ হেসে বললেন, হে মহারাজ, বিদর্ভদেশে ভীমসুতা দময়ন্তীর স্বয়ংবর উপলক্ষ্যেই যাচ্ছেন আশা করি। এদিকে, আজ সকালেই রাজকুমার পুষ্কর আমাকে জানালেন যে তিনিও বিদর্ভদেশে ঐ একই উদ্দেশ্যেই যেতে চান। এখন একই স্বয়ংবর সভায় দুই ভাইয়ের যাওয়া কী শোভন দেখায়?

রাজা নল বিস্মিত হয়ে বললেন, পুষ্কর…ঐ স্বয়ংবর সভায় যাবে? কিন্তু…

মন্ত্রী বললেন, তাঁকে তো বদ্ধ পরিকরই মনে হচ্ছে।

নল বললেন, কিন্তু স্বয়ংবর সভাতে তো শুধু রাজারাই যায়। তা হলে তো এখনই এ রাজ্যের একটি অংশ পুষ্করকে দিয়ে তাকে রাজপদে উন্নীত করতে হয়।

মন্ত্রী বললেন, না, না মহারাজ, এ সব কোন কাজের কথা নয়। আপনার স্বর্গত পিতা এই রাজ্য ভাগের বিরোধী ছিলেন। রাজকুমার পুষ্করের জন্য



অন্য কোন রূপ-গুণবতী কন্যার সন্ধান আনা যাবে পরে। আপনি বেরিয়ে পড়ুন।

নল বললেন, আপনি রাজকুমার পুষ্করকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, এই স্বয়ংবর সভায় যাবার ব্যাপারে আমার বিশেষ আগ্রহের কারণ আছে, এখানে তার যাওয়া নিরর্থক হবে। আমি ফিরে এসে পুষ্করের বিবাহের জন্য বিশেষ যত্ন করব।

এরপর তুমুল বাদ্য নিনাদের মধ্যে অশ্ব, গজ, রথ ও পদাতিকদের সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন রাজা নল।

ঠিক সেই সময়ে স্বর্গে কয়েকজন দেবতা বসে বিশ্রম্ভালাপ করছিলেন। সদ্য পৃথিবী পরিক্রমা করে এসে দেবর্ষি নারদও সেখানে উপস্থিত। কথায়

কথায় ইন্দ্র যমকে বললেন, কী ব্যাপার যমরাজ, বেশ কয়েকদিন হল স্বর্গে কোন রাজা আসে নি কেন?

যম বললেন, আমিও তো তাই ভাবছি। একটু আশ্চর্যের বিষয়ই বটে।

ইন্দ্র বললেন, পৃথিবীর রাজাগণ নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করতে খুব ভালবাসেন। সেই কারণে প্রতিদিনই দু-একজন রাজার সমরক্ষেত্রে মৃত্যু হয়, তারপর তাঁরা স্বর্গে চলে আসেন। কয়েকদিন কোন রাজাকে দেখছি না যে!

দেবর্ষি নারদ বললেন, এর কারণটি আমি জানি।

অন্য দেবতারা বললেন, বলুন তো, শুনি শুনি।

নারদ বললেন, পৃথিবীর মানবীদের মধ্যে এখন রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ হল বিদর্ভ রাজার কন্যা দময়ন্তী। আগামী শুক্লপক্ষে তার স্বয়ংবর সভা। সেই দময়ন্তীকে বিবাহ করার জন্য সমস্ত দেশের রাজা বিদর্ভ দেশে সমবেত হয়েছেন। ঐ রমণী-রত্নকে লাভ করার জন্য তাঁরা এখন এতই ব্যাকুল যে পররাজ্য জয় কিংবা যুদ্ধচিন্তা ভুলে গিয়ে রাজারা সকলেই এখন উত্তম প্রসাধন এবং শরীরকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার চেষ্টায় সর্বক্ষণ ব্যাপৃত।

সুন্দরী রমণীর কথা শুনে ইন্দ্র একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি ব্যাগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তাই নাকি, রাজকন্যা দয়মন্তী এমনই আকর্ষণীয়া? তার রূপের একটু বর্ণনা করুন তো!

দেবর্ষি নারদ দময়ন্তীর এমনই বর্ণনা দিলেন যে মনে হল স্বর্গে দেবীদের মধ্যেও সর্বাংশে অমন রূপসী বুঝি একজনও নেই।

তা শুনে ইন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় যোগ দিতে চললাম।

অন্য তিনজন দেবতাও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আপনি একা যাবেন কেন, দেবরাজ! দময়ন্তী নাম্নী এই কামিনীটির রূপ গুণের কথা শ্রবণ করে আমাদেরও ইচ্ছে হয়েছে তার স্বয়ংবর সভায় যেতে।

ইন্দ্র বললেন, তা হলে চলুন। আর বিলম্বে কাজ কী!

দেবর্ষি নারদ তখন রহস্য করে বললেন, আপনারা যাচ্ছেন যান, তবে আপনাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

ইন্দ্র বললেন, কেন? পার্থিব রাজাদের মধ্যে কেউ সুরলোকবাসী দেবতাদের চেয়েও যোগ্যতর আছে নাকি? আমরা উপস্থিত থাকলে কোন মানবী আমাদের ছেড়ে কোন মরণশীল মনুষ্যকে পতিপদে বরণ করতে চাইবে?

নারদ বললেন, আমি এই গূঢ় কথা জানি যে রাজকুমারী দময়ন্তী তার হৃদয়ে গুপ্তভাবে আগে থেকেই একজনকে স্বামীরূপে মনোনীত করে রেখেছে!

জলদেবতা বরুণ প্রশ্ন করলেন, কে সে ?

নারদ বললেন, তিনি নিষধ দেশের অধিপতি রাজা নল। তিনি রূপে রতিপতি ও তেজে দিনপতির তুল্য। তাকে আপনারা তুচ্ছ মনে করবেন না।

বরুণ বললেন, চলুন না, গিয়েই দেখা যাক।

ইন্দ্র একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, এই নল নামক রাজাটিকে নিরস্ত করার উপায় আমার মনে এসেছে।

ইন্দ্র সমেত চার দেবতা স্বর্গ ছেড়ে নেমে এলেন পৃথিবীতে।

রাজা নল অনেক দেশ পেরিয়ে যখন প্রায় বিদর্ভ দেশের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন, এমন সময় সহসা তাঁর রথের সামনে সেই চার দেবতা উপস্থিত হলেন। সেই দিব্যকান্তি জ্যোতিষ্মান চারজন পুরুষকে দেখে বিস্মিত হয়ে নল রথ সংবরণ করলেন। এবং এঁরা নিশ্চয়ই দেবতা হবেন—এই মনে করে তিনি সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলেন।

চার দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে ইন্দ্র নলকে আশীর্বাদ করে বললেন, হে আয়ুষ্মান, তোমার শৌর্য, বীর্য ও সত্যনিষ্ঠার খ্যাতি শুনে আমরা তোমার কাছে এসেছি। আমরা একটি ব্যাপারে তোমার সাহায্যপ্রার্থী। তুমি আমাদের সাহায্য করতে রাজি আছ কি ?

নল বিনয়ের সঙ্গে বললেন, দেবতাদের কোন কাজে যদি আমি বিন্দুমাত্র সহায়তা করতে পারি তাতে আমিই ধন্য হব।

ইন্দ্র আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাদের চারজনের হয়ে কোন এক স্থানে দূত হিসেবে যাবে ?

বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে নল বললেন, নিশ্চয়ই। তবে সে স্থান কি খুব দূরে ?

ইন্দ্র বললেন, না দূরে নয়, নিকটেই।

নল বললেন, আমি অবশ্যই আপনাদের হয়ে দৌত্যকার্য করব। আমার এই গতিশীল অশ্বগুলি দূরের পথও চোখের নিমেষে অতিক্রম করতে পারে।

ইন্দ্র হৃষ্টভাবে বললেন, বাঃ!

অন্য দেবতারাও পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্য করতে লাগলেন।

নল এবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি জানতে পারি, আমি কার সঙ্গে কথা

বলছি ? এবং কাদের হয়ে দৌত্যকার্য করতে যাচ্ছ ?

ইন্দ্র বললেন, ও, তোমাকে আমাদের পরিচয়ই দেওয়া হয়নি। জটাজুটধারী এই যাঁকে দেখছ, ইনি অগ্নি। আর মাথায় কনক মুকুট পরা গম্ভীর বদন যে দেবতাটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, ইনি কালান্তক যম। আর বাকি জনের নাম বরুণ, ইনি জলের তলাতেই বেশীর ভাগ সময় কাটান। আর আমি ত্রিদেশাধিপতি, স্বর্গের নন্দনকাননের প্রভু ইন্দ্র।

অন্য তিন দেবতা পরস্পরের দিকে তাকালেন, তারপর অগ্নি বললেন, উঁহু। এভাবে পরিচয় দেওয়া ঠিক হল না। যে-কেউ শুনে মনে করবে, আমাদের চারজনের মধ্যে ইন্দ্রই বুঝি যোগ্যতম।

ইন্দ্র সহাস্যে বললেন, তাতে কোন সন্দেহ আছে নাকি ?

বরুণ বললেন, দূতের মুখে প্রত্যেকের প্রকৃত পরিচয়ই দেওয়া উচিত।

অগ্নি বললেন, আমাকে জটাজুটধারী বলায় মনে হবে, আমি বুঝি এক তিন কাল ক্ষয়িত বৃদ্ধ ! বস্তুত অগ্নির কোন বয়স নেই, স্বর্গ-মর্ত-পাতালে অগ্নির চেয়ে পবিত্র আর কিছুই না এবং আমি যে কোন সময় যে কোন রূপ ধারণ করতে পারি।

যম বললেন, আমাকে কালান্তক বলে বর্ণনা করায় মনে হবে বুঝি আমি খুবই ভয়াবহ। প্রকৃত পক্ষে আমি ধর্মরাজ, ধর্মের যাবতীয় পুণ্য দিয়ে গড়া আমার শরীর এবং যারা ধর্মপথে থাকে তাদের জন্য আমি স্বর্গের দ্বার খুলে দিই।

বরুণ বললেন, আমি অধিকাংশ সময় জলের তলায় থাকি শুনলে কেউই আমার সঙ্গ প্রার্থনা করবে না। প্রকৃত পক্ষে জল থেকেই সমুদয় বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টি, আবার আমি ইচ্ছে করলেই সবকিছু জল দ্বারা আচ্ছন্ন করে দিতে পারি। জল থেকেই সমস্ত রূপের উদ্ভব।

দেবতাদের মুখে এমন আত্মশ্লাঘা শুনে রাজা নল উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলেন। তাঁর রথের অশ্বগুলি অস্থির ভাবে পা ঠুকছে মাটিতে। তাঁর নিজের মধ্যেও রয়েছে চাঞ্চল্য। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কার কাছে এবং কী ব্যাপারে আমাকে দৌত্য করতে যেতে হবে। অনুগ্রহ করে এবার তা বলবেন কি ?

ইন্দ্র বললেন, বিদর্ভ দেশের রাজা তাঁর কন্যা দময়ন্তীর জন্য স্বয়ংবর সভার আহ্বান করেছেন। তুমি সেই স্বয়ংবর সভা শুরু হবার আগেই রাজকন্যা দময়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এবং তার কাছে আমাদের পরিচয় দিয়ে বলবে যে আমরা চার দেবতা তার পানিপ্রার্থী, সে যেন আমাদের মধ্যে যে কোন একজনকে পতিত্বে বরণ করে।

যেন একখণ্ড কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল দিনমনি। রাজা নলের মুখে পড়ল আতঙ্ক ও বিষাদের ছায়া। তিনি অস্ফুট ভাবে বললেন, এ হতে পারে না! হতেই পারে না! আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কৌতুক করছেন।

ইন্দ্র বললেন, এর মধ্যে কৌতুকের কী দেখলে, রাজা!

যম বললেন, মধ্য দিনে, পথের মধ্যে আমরা তোমার সঙ্গে কৌতুক করতে এসেছি এমন কথাই বা তোমার মনে এলো কী করে?

নল বললেন, আমি নিজেই দময়ন্তীর একজন প্রার্থী, আমি তাকে আপনাদের মধ্যে একজনকে বরণ করতে বলব কেমন করে? আপনারা যে উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন আমারও সেই একই উদ্দেশ্য, তাহলে আমাকে আপনাদের দূত হিসেবে নিয়োগ করা কি সমীচীন?

ইন্দ্র বললেন, কিন্তু তুমি নিজেই আমাদের দৌত্য করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছ।

নল বললেন, যে পুরুষ এক রমণীরত্নকে লাভ করবার জন্য বদ্ধপরিকর সে কখনও সেই রমণীকে অপর কারুর হাতে তুলে দিতে পারে না। আমার দ্বারা আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। আপনারা আমায় ক্ষমা করুন।

যম বললেন, এখানে তো আমাদের ক্ষমার কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমরা তো তোমাকে কোন অভিশাপ দিইনি যে ফিরিয়ে নেব! তুমি একটি কাজ করতে সত্যবদ্ধ হয়েছ, এখন যদি সে সত্য ভাঙো, তা হলে তার দায় তোমাকেই ভোগ করতে হবে। তুমি অধর্ম পথে পতিত হবে।

বরুণ বললেন, এক নারীর প্রতি আকর্ষণের নিমিত্ত তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে না? এর পরেও তুমি নিজ জীবনে সুখের প্রত্যাশা কর?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজা নল বললেন, তবে তাই হোক। সত্যই সবচেয়ে বড়। না জেনে আপনাদের কাছে অঙ্গীকার করেছি, তবু আমি তা রক্ষা করব। দময়ন্তীর মাল্য প্রার্থী রাজা হিসাবে নয়, আপনাদের দূত হয়েই আমি যাব ঐ স্বয়ংবর সভায়। কিন্তু রাজকন্যা তো থাকবেন অন্তঃপুরে, স্বয়ংবর শুরু হবার আগে আমি তার সঙ্গে দেখা করব কী করে?

ইন্দ্র বললেন, সে জন্য কোন চিন্তা নেই। আমাদের প্রভাবে তুমি সকলের অগোচরে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারবে, কোন দ্বারপাল বা প্রহরী তোমায় দেখতে পাবে না। যাও, আর বিলম্ব কর না।

নিজের অনুচর ও পাত্র-মিত্রদের পরে আসতে বলে রাজা নল একা রথ ছুটিয়ে এগিয়ে গেলেন সামনে। রাজপুরীর সিংহদ্বারের কাছে তিনি নামলেন,

আশ্চর্য, সত্যিই কেউ তাঁকে দেখতে পেল না। বিনা বাধায় তিনি প্রবেশ করতে লাগলেন ভেতরে। সোজা এসে উপস্থিত হলেন রাজকন্যা দময়ন্তীর নিজস্ব মহলে।

দময়ন্তী তখন সখীদের মাঝখানে বসে প্রসাধন করছেন। তাঁর কেশরাশি উন্মুক্ত, কেয়ূর-কঙ্কন-কুঙ্কুম-চন্দনে তাঁকে সাজিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন সখীরা। তিনি আবেশে চক্ষু মুদে আছেন।

দময়ন্তীকে দেখেই রাজা নল কামমোহিত হলেন, তাঁর দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হতে লাগল। তাঁর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হল। তবু অতি কষ্টে নিজের আবেগ দমন করলেন তিনি। তাঁকে সত্য প্রতিপালন করতে হবে। তিনি বিষণ্ণ নিশ্বাস ফেলে মনে মনে বললেন, এই কন্যা আমার হবে না।

একবার চক্ষু খুলে সামনেই নলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দময়ন্তী চমকে উঠে বললেন, ও মা!

তখন রাজকন্যার সখীরাও তাঁকে দেখতে পেল। শত শত প্রহরী পরিবেষ্টিত অন্তঃপুরে কোন অচেনা পরপুরুষের প্রবেশের মতন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। রাজা নলের অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব দেখে তারা স্তম্ভিত হল এবং ভাবল, ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবতা বা যক্ষ বা গন্ধর্ব হবেন।

রাজা নল উদাসীন মুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দময়ন্তী তাঁকে দেখা মাত্র বিচলিত হলেন, তাঁর বক্ষ কম্পিত হল। তিনি কোনক্রমে জিজ্ঞেস করলেন, হে মহাভাগ, আপনি কে? আর কী নিমিত্তই বা এখানে এসেছেন?

রাজা নল ধীর স্বরে বললেন, হে কল্যাণী, আমি দেবতাদের একজন অগ্রিম দূত।

দেবতাদের কাছ থেকে আপনার জন্য একটা বার্তা নিয়ে এসেছি।

দেবতারা বার্তা পাঠিয়েছেন শুনে দময়ন্তীর শরীর রোমাঞ্চিত হল। তিনি কি এমনই সৌভাগ্যবতী যে দেবতারাও তাঁর প্রতি স্নেহশীল!

দেবতাদের বার্তা নিভৃতে শুনবেন বলে তিনি আসন ছেড়ে উঠে সখীদের কাছ থেকে সরে গিয়ে বাতায়নের পাশে চলে এলেন। সেখান থেকে নলকে ইঙ্গিতে ডেকে তিনি বললেন, কী এমন পুণ্য করেছি যে দেবতারা আমায় স্মরণ করেছেন, তা জানি না। দেবতাদের বার্তা শোনবার জন্য আমি উতলা হয়েছি। আপনি বলুন।

দময়ন্তীর মুখের দিকে না তাকিয়ে ভূমির দিকে চক্ষু রেখে রাজা নল বললেন, ইন্দ্র, অগ্নি, ধর্মরাজ ও বরুণ আমাকে এখানে প্রেরণ করেছেন। এই



চারজন দেবতাই আপনাকে অভিলাষ করেন। আপনি প্রসন্ন মনে এঁদের অন্যতমকে পতিত্বে বরণ করুন।

সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। দময়ন্তী তাঁর বক্ষ চেপে ধরলেন। ভীত, পাংশু মুখে তিনি বললেন, হে দূত, তুমি আমাকে এ কী কঠিন সংবাদ শোনালে! দেবগণকে আমি প্রণিপাত করি, কিন্তু আমি তো তাঁদের যোগ্য নই! তা ছাড়া আমি মনে মনে একজনকে ইতিপূর্বেই বরণ করে রেখেছি।

ব্যাকুল ভাবে রাজা নল জিজ্ঞেস করলেন, কে তিনি?

দময়ন্তী বললেন, সে নাম জানার কোন প্রয়োজন নেই, দূত। তুমি দেবতাদের কাছে গিয়ে বল, আমি তাঁদের কাছে শতকোটিবার ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তাঁরা যেন আমার ওপর রুষ্ট না হন। আমি এই পৃথিবীরই এক নরপতির পূর্ব মনোনীতা।

রাজা নল বললেন, দেবগণের অপ্রিয় আচরণ করলে মানুষ কখনো সুখ পায় না। তুমি দেবতাদের ছেড়ে পৃথিবীর সামান্য একজন মানুষকে কেন বরণ করবে?

দময়ন্তী হঠাৎ তীক্ষ্নস্বরে প্রশ্ন করলেন, সত্য করে বল তো, তুমি কে? তোমার নিজের পরিচয় কী?

রাজা নলের মুখখানি বিমর্ষ হয়ে গেল। তিনি নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললেন, আমি দেবতাদের একজন দূত মাত্র। আমার অন্য কোন পরিচয় অবান্তর।

দময়ন্তী বললেন, দুগ্ধধবল সেই হংসটির রূপ বর্ণনা শক্তি অতি নির্ভুল। তাছাড়া আপনাকে দেখামাত্র আমার রক্তোচ্ছ্বাস প্রবল হয়েছিল, আমার চক্ষু নিষ্পলক হয়েছিল। এখন আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। হে রাজন, এ কি রহস্যের পরীক্ষা করতে এসেছেন আমার সঙ্গে? আপনি কি জানেন না যে শুধু আপনার জন্যই স্বয়ংবর সভার আয়োজন হয়েছে? আমি যে আপনার প্রতীক্ষাতেই অধীর হয়ে আছি। তবু আমার সঙ্গে এ ছলনা করছেন কেন?

রাজা নল বললেন, তুমি এই দেবতাদের যে কোন একজনকে পতিত্বে বরণ করলে দিব্যমাল্য, অলৌকিক বস্ত্র ও অলঙ্কার লাভ করবে এবং নিরবধি কাল সুখ সাগরে ভাসবে। দ্যাখ, যিনি এই পৃথিবীকে এক মুহূর্তে দগ্ধ করতে পারেন, যাঁকে দিয়ে কোন পুণ্যকর্ম হয় না, কোন্ রমণী না সেই অগ্নিকে প্রার্থনা করে? অথবা স্বর্ণমুকুটধারী ধর্মরাজ যম, যাঁর প্রসন্ন হাস্যের জন্য জীবমাত্রই ব্যাকুল হয়ে থাকে, কোন্ রমণী প্রত্যাখ্যান করতে পারে তাঁকে? অথবা যিনি স্বর্গরাজ্যের প্রভু, দেব-দানবগণের হন্তা এবং প্রণয়ী হিসেবে যাঁর খ্যাতি ত্রিকালব্যাপ্ত সেই ইন্দ্রকে তুমি চাও না? কিংবা রূপে যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি স্বয়ং রূপের নির্মাতা, সেই জলাধিপতি বরুণ দেবতার কথা তুমি একবার চিন্তা করে দেখ।

দময়ন্তীর অন্তরে অভিমান ও ক্রোধ জেগে উঠল। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, আপনি স্বয়ং বীর্যশালী পুরুষ হয়েও আমার সমক্ষে দেবতাদের গুণকীর্তন করছেন কেন? আপনি কি আর আমাকে কামনা করেন না? আমি শুধু এর উত্তরই শুনতে চাই।

রাজা নল বললেন, হংসমুখে তোমার বার্তা পেয়ে আমি আমার অন্তরে তোমার

একটি মানস-প্রতিমা নির্মাণ করে প্রতিদিন তারই ধ্যান করেছি। ভেবেছিলাম, সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়েও তোমাকে পেলে আমি ধন্য হব। কিন্তু নিয়তি হল প্রতিবন্ধক। দেবতারা নিশ্চয়ই আমার চেয়ে অনেক গুণ বেশী যোগ্যতর প্রার্থী। তাঁদের ছেড়ে তুমি আমায় গ্রহণ করতে যাবে কেন? আমি দেবতাদের দূত হয়ে এসেছি, তোমার কাছ থেকে একটি উত্তর আমায় নিয়ে যেতে হবে তাঁদের কাছে।

অভিমান ও ক্রোধের পরেই আসে কান্না। দময়ন্তী কোনক্রমে উদ্গত অশ্রু রোধ করে বললেন, দেবতাদের কথা আমি জানি না। আপনি যদি আমায় প্রত্যাখ্যান করেন তা হলে আমি বিষ পান অথবা অগ্নি বা জলপ্রবেশ অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করব এতে সন্দেহ নেই। মনে মনে একবার আপনাকে বরণ করেছি, এরপর অপর কারুর অঙ্কশায়িনী হয়ে আমি অসতী হতে পারব না।

এবার রাজা নলও আর নিজেকে দমন করতে পারলেন না। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে তিনি বাষ্পজড়িত কণ্ঠে বললেন, হে সুকুমারী, হে অলোকসামান্যা, তুমি যদি স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দাও, তবে জেনে রেখ, তারপর এক লহমাও আমি জীবন ধারণ করব না। বস্তুত, দেবতাগণ তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করেছেন এ কথা জানার পরই আমি আত্ম-বিসর্জনের কথা ভেবেছি। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব কী করে? কিন্তু আমি দেবতাদের কাছে তাঁদের দৌত্য করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখন আমি তোমার কাছে প্রণয় নিবেদন করলে তাঁদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হবে। এখন বল কী উপায়ে আমি তোমায় পেতে পারি।

দময়ন্তী বললেন, মহারাজ উঠুন, যদি আমাদের পরস্পরের হৃদয় অঙ্গাঙ্গী থাকে, তাহলে বাইরের কোন বাধাই বাধা নয়। দেবতাদের কাছে আপনি যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তা তো পালন করছেনই। এবার তাঁদের সম্মুখে গিয়ে আমার এই উত্তর নিবেদন করুন। আপনি বলবেন, দময়ন্তী আপনাদের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে আপনাদের সকলকেই স্বয়ংবর সভায় নিমন্ত্রণ করেছে। সেখানে সে আপনাদের সমক্ষেই রাজা নলের কণ্ঠে মালা দেবে।

রাজা নল ফিরে গেলেন রাজপ্রাসাদের বাইরে। দেবতা চতুষ্টয় সেখানে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন তাঁর জন্য। রাজা নল তাঁদের প্রণাম জানিয়ে বললেন, আপনারা আমার অপরাধ গ্রহণ করবেন না। আমি পৃথক ভাবে আপনাদের চারজনের হয়েই সমানভাবে দময়ন্তীর কাছে দৌত্য করেছি। তার উত্তরে দময়ন্তী যা বলেছেন, তাও আপনাদের জানাচ্ছি।

রাজা নল হুবহু দময়ন্তীর বার্তার পুনরুক্তি করলেন।

তাই শুনে ইন্দ্র বক্র হাস্যে বললেন, ও, এই ব্যাপার! আচ্ছা, দেখা যাক্।

॥ তিন ॥

শুভকাল, পুণ্যতিথি ও পবিত্রক্ষণ দেখে মহারাজ ভীম তাঁর কন্যার স্বয়ংবর সভার উদ্বোধন করলেন। আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মতন সমাগত রাজন্যবৃন্দ সভামণ্ডপ উজ্জ্বল করে রয়েছেন, সাজপোশাকের প্রতিযোগিতায় তাঁরা পরস্পরকে হারাতে চেয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে আড়চোখে দেখছেন। তাঁদের চক্ষু কামনায় ব্যাগ্র, হৃদয় অধীর।

সভামণ্ডপের কনক তোরণগুলি ফুলমালায় সজ্জিত। সুগন্ধি ধূপে ভিতরের বাতাস আমোদিত এবং বীণাবাদিকারা অলক্ষ্যে থেকে সুর ঝঙ্কার তুলছেন। সকলেই মনে মনে ভাবছেন, একসঙ্গে এত রাজ সমারোহ এবং মণ্ডপের এমন সাজসজ্জা আর কোন স্বয়ংবর সভায় দেখা যায়নি।

এক সময় সখীদল পরিবৃতা হয়ে, মুক্তামালার মধ্যে বৈদুর্যমনির মতন রাজকুমারী দময়ন্তী প্রবেশ করলেন রঙ্গস্থলে। তৎক্ষণাৎ সমস্ত রাজগণের চক্ষু আকৃষ্ট হল দময়ন্তীর দিকে, আর দময়ন্তীর চক্ষু শুধু খুঁজতে লাগল একজনকে।

রাজগণের দৃষ্টি নির্নিমেষ, নিশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে গেছে তাঁদের। প্রতিনিধিরা এক একজনের নাম উচ্চারণ করে যখন পরিচয় জ্ঞাপন করছেন তখন তাঁরা সচকিত হয়ে উঠেছেন। এদিকে ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ সভাগৃহে একবার চঞ্চল দৃষ্টিপাত করে একটি দৃশ্য দেখে দময়ন্তীর হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হল।

এক একজন রাজার সামনে এসে বিনীত প্রণতী জানিয়ে দময়ন্তী এগিয়ে যেতে লাগলেন। প্রত্যাখ্যাত রাজাদের মুখ অমনি কালিমাবর্ণ হল, তাঁরা নিম্নে চক্ষু নামিয়ে কয়েকবার উষ্ণ নিশ্বাস ফেলে চক্ষু তুললেন আবার। মহীপালের মধ্যে কে আজ দময়ন্তীর করধৃত মাল্য কণ্ঠে ধারণ করবেন। সকলেই তা দেখতে চান।

সভার মধ্যস্থলে এসে দময়ন্তী থমকে দাঁড়ালেন। সেখানে অবিকল নল রাজার মতন দেহকান্তি-সম্পন্ন পর পর পাঁচজন পুরুষ বসে আছেন। প্রত্যেকেরই আকৃতি ও বসন-ভূষণ অবিকল এক রকম, কোন ক্রমেই একজনের সঙ্গে অপরজনের প্রভেদ করবার উপায় নেই। হংসের সাহায্যে প্রেরিত সঙ্কেত বাক্যে দময়ন্তী জানিয়েছিলেন যে রাজা নল যেন স্বয়ংবর সভায় কণ্ঠে মন্দার

পুষ্পের মাল্য ধারণ করে আসেন। দময়ন্তী দেখলেন যে নল-প্রতিম সেই পঞ্চ পুরুষের কণ্ঠেই মন্দার পুষ্পের মাল্য দোদুল্যমান।

পর্যায়ক্রমে পাঁচজনের প্রতিই অপলক দৃষ্টিপাত করেও দময়ন্তী তাঁর প্রকৃত দয়িতকে চিনতে পারলেন না। তিনি এই কথাও বুঝলেন যে স্বাভাবিক সঙ্কোচ বশতঃ রাজা নল নিজ বক্ষে হাত দিয়ে এই যে আমি নল, এ কথা বলবেন না। তাছাড়া দেবতাদের মায়ায় পাঁচজনেরই নল-রূপ হয়তো শুধু দময়ন্তীর দৃষ্টিতেই প্রতিভাত হচ্ছে। কেননা অন্য রাজগণ তো এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছেন না, এমন কি সখীদের মধ্যেও কোন ভাব-বৈকল্য নেই, বরং তারা দময়ন্তীকে এক স্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখেই কৌতূহলী হয়েছে।

মাল্যসমেত হাত দুখানি যুক্ত করে দময়ন্তী বললেন, হে দেবগণ, আপনাদের নমস্কার করি। আমি সামান্য নারী, আপনাদের দৈবী মায়া আমার ওপর প্রয়োগ করা যেন ক্ষুদ্র এক হরিণ শিশুকে আবদ্ধ করার জন্য শত সহস্র করাল অস্ত্রধারী সৈনিক নিয়োগ করার মতন। অথবা আপনারা কৌতুক মনে করে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষণটিতে বিপর্যয় ঘটাতে চাইছেন। বৃক্ষশীর্ষের শুকপক্ষীর উপর বজ্রপাত যেমন আকাশের কৌতুক। তবু আমি বলি, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ নল ভূপতিকে আমি ইতিপূর্বেই আমার অন্তরে পতিত্বে বরণ করেছি। সুতরাং আমি অন্যপূর্বা, সেই পুণ্যশ্লোক নৃপতি ব্যতীত আমি আর কারুকেই গ্রহণ করতে পারি না। অতএব হে দেবগণ, এখন যথার্থ রূপে তাঁকে নির্দেশ করুন।

দময়ন্তীর এই প্রকার অনুনয় শুনেও দেবতারা নীরব রইলেন।

দময়ন্তী এবার আরও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, যদি আমার অন্তর পবিত্র থাকে, যদি আমি সত্য ছাড়া কখনো মিথ্যা না বলে থাকি, যদি রাজা নলের প্রতি আমার অনুরাগ যথার্থ হয়, যদি সঙ্কল্প রক্ষাকে আমি সমস্ত সুখ সম্ভোগের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে থাকি, তবে আমার দৃষ্টিশক্তি শতগুণ বর্ধিত হোক। আমি যেন প্রকৃত ও প্রতিরূপের পার্থক্য বুঝতে পারি।

দময়ন্তী আবার সেই পঞ্চ-নলের প্রত্যেকের দিকে দৃষ্টি ন্যস্ত করলেন। এবার তিনি দেখতে পেলেন, এঁদের মধ্যে চারজনের কণ্ঠমালার ফুলগুলি একেবারে অম্লান, তাজা, এঁদের মুখমণ্ডলে কোন স্বেদবিন্দু নেই, নেত্রপাত স্থির, এঁদের আসন ভূমি থেকে সামান্য একটু উচ্চে উঠে আছে। বাকি একজনের গলার মালার ফুল একটু নেতিয়ে গেছে, ঘামে ভেজা কপাল চকচক করছে আলোয়,

এঁর চোখের পলক পড়ছে এবং এঁর শরীরের পিছনে লুটিয়ে আছে ছায়া।

তখন কম্পিত পদে এগিয়ে এসে দময়ন্তী তাঁর হাতের মালা সেই পার্থিব পুরুষের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন।

তৎক্ষণাৎ রাজা নল উঠে দাঁড়িয়ে দময়ন্তীর হস্ত ধারণ করে দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, হে বৈদর্ভী, তুমি যে দেবতাদের সন্নিধানে আমাকেই বরণ করলে, সেজন্য আমি কৃতার্থ। এখন আর কেউ যদি তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে আসে, তাহলে সে আমার বাহুবল দেখবে। এমন কি দেবতারাও তোমাকে আর আমার হস্ত বিচ্যুত করতে পারবেন না। সর্বসমক্ষে বলছি, যতকাল জীবন ধারণ করব, ততকাল আমি তোমারই প্রণয় পরবশ হয়ে থাকব।

দময়ন্তীর নল-নির্বাচনে অন্যান্য নৃপতিরা হাহাকার করে উঠলেন। দেবতা চারজনের মুখে দেখা গেল হাস্য রেখা। ইন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হে কল্যাণী, তুমি সততা ও বুদ্ধিবলে আমাদের সমস্ত কৌশল পর্যুদস্ত করেছ। আমরা সুরলোকবাসীরা আনন্দের সঙ্গে হার স্বীকার করে নিতে জানি। এখন অত্যন্ত সন্তুষ্ট মনে আমরা রমণীশ্রেষ্ঠা তোমাকে এবং সৌভাগ্যবান রাজা নলকে আশীর্বাদ করছি, তোমাদের মিলন সুখময় হোক, তোমাদের জীবনের শান্তি ও সমৃদ্ধি চির বিরাজমান থাকুক।

দেবতারা তখুনি চলে যাবার জন্য উদ্যত হলে রাজা নল তাঁদের বললেন, এখুনি যাবেন না, কৃপা করে অন্তত কিছু মিষ্টান্ন ভোজন করে যান।

নল-দময়ন্তীর বিবাহ উৎসব চলল পক্ষকাল ব্যাপী। দেবতারা ফিরে গেলেন সেদিনই রাত্রে। তাঁদের ফেরার পথে আর এক কাণ্ড সংঘটিত হল।

বনপথ দিয়ে যেতে যেতে সেই চার দেবতা দেখলেন, বিপরীত দিক থেকে কলি ও দ্বাপর নামে দুজন দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতা হন্তদন্ত হয়ে আসছেন।

সেই দুজনকে দেখে ইন্দ্র বললেন, কী ব্যাপার, কলি, এমন ব্যস্তসমস্ত ভাবে কোথায় চলেছ ?

কলি বললেন, আমরা দেবর্ষি নারদের মুখে দময়ন্তী নামা এক মানবী কন্যার রূপ গুণের কথা শুনে মোহিত হয়েছি। শুনেছি শীঘ্রই তার স্বয়ংবর সভা হবে। তাতে অংশ নেবার জন্য চলেছি আমরা।

এ কথা শুনে উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন চার দেবতা।

বরুণ বললেন, বড্ড দেরি করে ফেলেছ হে ! আমরা তো সেই সভা থেকেই আসছি।

অগ্নি বললেন, এই তো আমরা সকলেই সেখান থেকে ভূরিভোজ সেরে এলাম।

যম বললেন, কন্যাটির রূপ গুণের কথা যা শুনেছ, তা যথার্থ বটে, কিন্তু—

ইন্দ্র বললেন, আগে এলেই বা কী হত! আমাদের চারজনের মধ্যে কেউ তার বরমাল্য পেলাম না···কলির উচ্চাকাঙ্ক্ষা খুব বেশী দেখছি।

অপমানে এবং ক্রোধে কলির মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেন, আপনাদের কেউ বরমাল্য পেলেন না, তা হলে কে পেল?

ইন্দ্র বললেন, নিষধদেশের রাজা নল।

কলি বললেন, কী! আপনাদের মতন মহান চার দেবতা উপস্থিত থাকতেও বরমাল্য পেল কিনা সামান্য একজন মানুষ? তার এত দূর স্পর্ধা? আপনারা তাকে কিছুই বললেন না? আমি উপস্থিত থাকলে সে পাপাত্মার মুণ্ড আমি তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করে দিতাম! আপনারা তাকে কোন শাস্তিই দিলেন না?

ক্রোধে কলির সারা দেহ কম্পিত হতে লাগল।

চার দেবতা তখন বললেন, আরে না না, তুমি এত বিচলিত হচ্ছ কেন? আমাদের সম্মতিক্রমেই দময়ন্তী-নলের মিলন হয়েছে। আমরা ওদের আশীর্বাদ করেছি। ওদের দুজনের পূর্ব থেকেই মনের মিল হয়েছিল, আমরা ওদের অনেক রকম পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়েছি। ওরা সত্যিই পরস্পরের যোগ্য।

কলি বললেন, তবু দেবতাদের সম্মুখে কোন মানুষের এ রকম স্পর্ধা দেখানো কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না। সেই নল রাজাকে শাস্তি পেতেই হবে।

অগ্নি বললেন, আরে না না! শাস্তি দেবার হলে কি আমরা দিতাম না? নল খুবই ধর্মপ্রাণ ও সত্যরক্ষক, তাকে অকারণে শাস্তি দিলে ধর্ম কখনোই তা সমর্থন করবেন না।

ধর্মরাজ যম বললেন, ঠিক।

কলি বললেন, আমি আপনাদের মতন মহাপ্রাণ নই। একবার ক্রোধ হলে আমি তা সংবরণ করতে পারি না। নলের প্রতি এই ক্রোধ নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই।

চারজন দেবতা, এমন কি দ্বাপরও অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন কলিকে। তিনি শুনলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ যাত্রা করলেন নিষধ রাজ্যের দিকে।

কলি যখন নিষধ দেশে এসে পৌঁছলেন, তখনও স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে আসেন নি। কলি গুপ্তভাবে অবস্থান করতে লাগলেন সেখানে। কয়েকদিন থাকার পরই কলি বুঝতে পারলেন যে রাজকুমার পুষ্করও নলের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষী

এবং তিনিও কোন উপায়ে নলের ওপর প্রতিশোধ নেবার বাসনায় মনে মনে ফুঁসছেন। কলি তখন ঠিক করলেন, এই পুষ্করের সাহায্যেই তিনি নলকে ধ্বংস করবেন। বিবাহ উৎসব সাঙ্গ হবার পর দময়ন্তীর সঙ্গে কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণ করে তারপর এক সময় নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন নল। যেদিন তিনি রাজধানীতে প্রবেশ করলেন সেদিন সমস্ত প্রজারা গৃহ থেকে বেরিয়ে এসে সম্বর্ধনা জানাল তাঁকে। কারণ ইতিমধ্যেই রটে গেছে যে বিদর্ভ রাজকন্যার স্বয়ংবর সভায় অন্যান্য রাজ্যের নৃপতি এমন কি কয়েকজন মহাশক্তিমান দেবতা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নিষধ দেশের রাজা নল বরমাল্য লাভ করেছেন। এ কী কম গর্বের কথা! প্রজারা নলের নামে তুমুল জয়ধ্বনি তুলল এবং নলের পাশে দময়ন্তীকে দেখেও তারা সন্তুষ্ট হল খুব। এ যেন হর-পার্বতীর মিলনের মতন সর্বাঙ্গসুন্দর যোটক।

দূর থেকে কলি দেবতাও দেখলেন নল-দময়ন্তীকে। ঈর্ষা ও ক্রোধের আগুন তাঁর শরীরে তখনও সমান ভাবে জ্বলছে। সেই ক্রোধের নিশ্বাসে তিনি এক মুহূর্তেই নলকে পুড়িয়ে মারতে পারেন। তবু তাঁকে সতর্ক হতে হল। তাঁর মনে পড়ল, অগ্নি তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, বিনা কারণে নলকে শাস্তি দিলে ধর্ম কখনই তা সমর্থন করবেন না, এবং সে কথা শুনে ধর্মরাজ যম বলেছিলেন, ঠিক। সুতরাং এখনই নলকে বিনাশ করলে ধর্মের রোষে পড়তে হবে। অতএব নলের ছিদ্রান্বেষণের জন্য অপেক্ষা করাই বিধেয়।

কলি চলে গেলেন রাজকুমার পুষ্করের সন্নিধানে। অচিরেই পুষ্করের সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্যের মিলন হল। দুজনে মিলে নল-নির্যাতনের পরামর্শ করতে লাগলেন। কলি পুষ্করকে উত্তেজিত করতে লাগলেন এই বলে যে নলের সর্বনাশ করা গেলে পুষ্কর একই সঙ্গে এই রাজ্যের অধীশ্বর হবেন এবং দময়ন্তীকে পাবেন।

কলি জিজ্ঞেস করলেন, রাজকুমার পুষ্কর, ঠিক মতন ভেবে বল তো, নলের কোন্ দোষ অবলম্বন করে তার বিনাশের পথ প্রশস্ত করা যায়?

আকাশ-পাতাল চিন্তা করেও পুষ্কর কিছু বলতে পারলেন না। নলের দোষ-ছিদ্র পাওয়া সহজ নয়। নল বহু গুণের অধিকারী। তিনি ধর্মপালক। প্রজানুরঞ্জক ও সত্যনিষ্ঠ, অকারণে তাঁর বিরুদ্ধতা করতে গেলে দেশবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে।

কলি আবার প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বেশ, কিন্তু নলের কি কোন বিশেষ ব্যাপারে আসক্তি কিংবা নেশা নেই?



পুষ্কর বললেন, হ্যাঁ, নলের আসক্তি আছে অক্ষক্রীড়ায়। তিনি অক্ষ-দ্যূতে অত্যন্ত কুশলী এবং এই ব্যাপারে তাঁর বেশ অহমিকা আছে। অক্ষক্রীড়ায় তিনি নিজেকে অজেয় মনে করেন।

কলি বললেন, এই তো পেয়েছি। রাজকুমার পুষ্কর, তুমি আজ থেকে উত্তমরূপে অক্ষক্রীড়া শুরু কর। তারপর কী হয় আমি দেখছি!

॥ চার ॥

রমণীরত্ন দময়ন্তীর সঙ্গে রাজা নল চরম সুখে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। দান, ধ্যান ও যজ্ঞের রক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। কখনো তিনি দময়ন্তীকে নিয়ে বন-বিহারে যান, কখনো যান নির্জন নদীতটে জলকেলি করতে। কিন্তু ভোগ বিলাসের মধ্যে ডুবে থাকলেও তিনি রাজ্য শাসনে অমনোযোগী হননি, দময়ন্তীও তাঁকে প্রজা-বিমুখ হতে দেননি। দায়িত্ব পালন ও আনন্দ সম্ভোগ ঠিক সমান সমান রইল। যাঁরা এই প্রকার করেন, তাঁদের জীবনে সুখ নিরবচ্ছিন্ন হয়।

ক্রমে এগারো বৎসর কেটে গেল। দময়ন্তী একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান উপহার দিলেন রাজাকে। কাল ধর্মেই এই দম্পতির আবেগের উন্মত্ততা কমে গিয়ে স্বাভাবিক হয়ে এলো।

একদিন রাজা নল কয়েকজন পাত্র-মিত্রের সঙ্গে শাসনকার্য সম্পর্কে আলাপ করছেন, এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন রাজকুমার পুষ্কর।

বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অভিবাদন করে রাজকুমার পুষ্কর বললেন, হে মহারাজ, অঙ্গদেশের অধিপতি আমায় দ্যূতক্রীড়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আপনার অনুমতি নিয়ে আমি সেখানে যেতে চাই।

এ কথা শুনে রাজা নল দারুণ বিস্ময়াপন্ন হলেন। ভুরু উত্তোলন করে তিনি বললেন, তুমি অঙ্গদেশের অধিপতির সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া করতে যাবে! তোমার এমন সাহস কী ভাবে হল! অঙ্গরাজ অক্ষদ্যূতে অতিশয় নিপুণ, তাঁর সঙ্গে তুমি কী খেলবে? তা ছাড়া তিনি রাজা, তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মতন তোমার সম্পদই বা কোথায়?

রাজকুমার পুষ্কর দম্ভের সঙ্গে বললেন, আপনি বোধ হয় জানেন না যে অক্ষদ্যূতে আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আমাকে পরাজিত করার সাধ্য কারুর নেই।

উপস্থিত পাত্র-মিত্ররা তখন রাজাকে জানালেন যে গত কয়েক বৎসর ধরে রাজকুমার পুষ্কর অক্ষক্রীড়ায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করছেন এবং দেশের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দ্যূতে আহ্বান করে তাঁদের কাছ থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ আহরণ করেছেন।

রাজাকে আরও উত্তেজিত করার জন্য পুষ্কর বললেন, আপনার যদি বিশ্বাস

না হয়, আপনি আমার সঙ্গে কয়েক বাজি খেলে দেখতে পারেন। তবে আমি পূর্বেই বলে রাখছি, আপনি পণে যা হারবেন, তা আর কোন ক্রমেই প্রত্যর্পণ করা যাবে না।

পুষ্করের দুর্বিনীত বাক্য শুনে রাজা নলের আত্মাভিমানে ঘা লাগল। তাঁর শরীরের প্রতিটি রোমকূপ সজাগ হল, তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, তবে এসো তোমার শখ মিটিয়ে দিই। বোধ করি বামন হয়ে তোমার চাঁদে হাত দেবার বাসনা হয়েছে। তুমি তোমার যথাসর্বস্ব রিক্ত হবার জন্য প্রস্তুত হও।

পুষ্কর বললেন, মহারাজ, এত কথার প্রয়োজন কী, ক্রীড়ার ফলাফলেই তো সব বোঝা যাবে।

তখন রাজা নল সদলবলে উঠে এলেন ক্রীড়াকক্ষে। পুষ্কর আসন গ্রহণ করলেন রাজার বিপরীত দিকে।

পুষ্কর এই এতগুলি বছর শুধু যে অক্ষক্রীড়া করেছেন তাই নয়, তাঁকে সাহায্য করার জন্য কলি স্বয়ং অক্ষের মধ্যে ঢুকে বসে আছেন।

রাজা বললেন, প্রথম বাজি দশটি কলস পূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা। আশা করি তা তোমার আছে ?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পুষ্কর কলি-প্রভাবিত অক্ষ ভূমিতে নিক্ষেপ করে বললেন, এই আমি জিতলাম !

রাজা দেখলেন পুষ্করেরই জয় হয়েছে।

এরপর রাজা বললেন, দ্বিতীয় বাজি একশত অশ্ব এবং একশত হস্তী।

পুষ্কর 'এই আমি জিতলাম' বলে দ্বিতীয়বার দান সমুদয় জিতে নিলেন।

কলির সহায়তাতেই যে পুষ্কর জিতছেন সে কথা বুঝতে পারলেন না নল। তাঁর জেদ উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে লাগল এবং বাজির পরিমাণও বাড়তে লাগল সেই অনুসারে। খেলা চলতে লাগল প্রহরের পর প্রহর। তারপর প্রহর ছাড়িয়ে দিন।

রাজ্যের মন্ত্রী এবং অন্যান্য পৌরজনেরা যখন শুনতে পেলেন যে রাজা নল দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হয়ে প্রভূত সম্পদ হারাচ্ছেন, তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন এর সঙ্গে পুষ্করের গভীর চক্রান্ত আছে। ন্যায় পথে পুষ্কর কিছুতেই রাজা নলকে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করতে পারেন না। তখন রাজা এবং রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁরা দারুণ উদ্বিগ্ন হলেন। রাজাকে এখনই নিবৃত্ত করা দরকার। ক্রীড়াকক্ষের দ্বারে প্রহরীদের রাজা নল নির্দেশ দিয়েছেন, কোন ক্রমেই আর কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।

তখন মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট পৌরজনেরা এসে ধরলেন দময়ন্তীকে। কোন প্রহরীই দময়ন্তীকে বাধা দিতে পারবে না। একমাত্র তিনিই পারেন রাজাকে বাইরে আহবান করে আনতে।

সকলের অনুরোধ শুনে এবং ঘটনার গুরুত্ব বুঝে দময়ন্তী তখনই গেলেন সেখানে। প্রহরীরা তাঁকে দেখে বিনা বাক্যে সরে দাঁড়ালেন। ভিতরে প্রবেশ করে দময়ন্তী সানুনয়ে বললেন, হে মহাভাগ, রাজভক্তিপরায়ণ মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিশেষ কোন রাজকার্যের প্রয়োজনে আপনার দর্শনপ্রার্থী। আপনি অনুগ্রহ করে একবার বাইরে আসুন।

পরাজয়ে পরাজয়ে আহত রাজা নল দময়ন্তীর দিকে ফিরে তাকালেন না পর্যন্ত। বাঁ হাত আন্দোলিত করে তিনি অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, এখন নয়, এখন নয়!

পুষ্কর লালসাপূর্ণ নেত্রে দময়ন্তীর দিকে চেয়ে রইলেন। সেই দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে দময়ন্তী সেখান থেকে চলে এলেন তৎক্ষণাৎ।

রাজমহিষীর ব্যর্থতার সংবাদ শুনে শুভানুধ্যায়ীরা নিরাশ হয়ে শোক করতে লাগলেন।

আরও অনেক প্রহর বাদে, রাজা নল ক্রমাগত হারছেন শুনে রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরা শেষ চেষ্টা করবার জন্য আবার এলেন দময়ন্তী সন্নিধানে। তাঁরা বললেন, হে রাজ্ঞী, কোন কারণে রাজার বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটেছে, এর ফলে সারা রাজ্যেই বিপর্যয় ঘটবে। এখন একমাত্র আপনিই রক্ষা করতে পারেন আমাদের। যে-কোন উপায়ে একবার রাজাকে ডেকে নিয়ে আসুন।

দময়ন্তী প্রজাবর্গের আকুল প্রার্থনা শুনে দ্বিতীয়বার গেলেন ক্রীড়া কক্ষে।

রাজা নলের নিকট এসে গভীর মর্মবেদনার সঙ্গে তিনি বললেন, হে নাথ, সম্মানিত ব্যক্তিগণ বাহিরে আপনার দর্শনের জন্য অপেক্ষমান, সমস্ত রাজকার্য উপেক্ষিত, এমন কি আপনি আমার সঙ্গে বা পুত্র-কন্যাদের সঙ্গেও একটিও স্নেহবাক্য বলেননি গতকাল থেকে। সেইজন্য, মিনতি করি, এখন এই ক্রীড়ার বিরতি দিয়ে আপনি একবার বাইরে আসুন। পরে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে হয় তো আবার শুরু করবেন।

রাজা নল ততক্ষণে তাঁর রাজকোষের সমস্ত ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং এবার তিনি তাঁর রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চল বাজি রেখেছেন। যত হারছেন, ততই ধনুকের ছিলার মতন টান টান হয়ে যাচ্ছে তাঁর স্নায়ুতন্ত্রী। কলির প্রভাবে বিমোহিত হয়ে তিনি কিছুতেই প্রতিপক্ষের অন্যায় কৌশল ধরতে পারছেন না।

এই সময় দময়ন্তীকে দেখে তাঁর মনে হল মূর্তিমতী বিঘ্ন। তাছাড়া দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে পুষ্করকে লুব্ধ ভাবে হেসে উঠতে দেখে তাঁর অন্তরাত্মা পর্যন্ত জ্বলে উঠল। তিনি অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তিরস্কার করে বললেন, দময়ন্তী, তুমি কেন বারবার আমার মনঃসংযোগ নষ্ট করতে আসছ? রাজমহিষীর স্থান অন্তঃপুরে, এমন ভাবে দ্যূত সভায় আসা তাঁর মোটেই শোভা পায় না!

দময়ন্তী আর্তস্বরে বললেন, মহারাজ—

নল তাঁর কোন কথা না শুনতে চেয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আদেশ দিলেন, যাও— !

এমন কঠোর ভাবে নল কোন দিন দময়ন্তীর সঙ্গে কথা বলেননি। দময়ন্তী যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল, তিনি দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

অন্য কারুর সঙ্গে দেখা না করে তিনি চলে এলেন অন্তঃপুরের এক নিভৃত অলিন্দে। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি রোদন করতে লাগলেন। অবিরল অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল তাঁর দুই চক্ষু দিয়ে। বিদর্ভরাজ ভীমের একমাত্র আদরিনী কন্যা এবং নিষধ-রাজ নলের একমাত্র ভার্যা দময়ন্তী তাঁর জীবনের এই প্রথম অবমাননায় আর কিছুতেই স্থির হতে পারলেন না।

একটুক্ষণ পরে বৃহৎসেনা নামে তাঁর এক অতি বিশ্বস্ত পরিচারিকা সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং ভয়ে ভয়ে গাঢ় স্বরে বলল, হে রাজ্ঞী—

দময়ন্তী বললেন, তুমি যাও, এখন আমার কাছে তোমরা কেউ এসো না।

বৃহৎসেনা তবু চলে গেল না। দময়ন্তীর আরও সন্নিকটে এসে সে বলল, এখন কান্নার সময় নয়। আমার কথা শুনুন। আপনার সম্মুখে আরও বড় বিপদ—দময়ন্তী মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললেন, আমি কোন বিপদের ভয় পাই না। নাথ আমার প্রতি ক্রোধ বাক্য বলেছেন, এর চেয়ে বড় দুঃখ আমার আর কিসে হবে?

বৃহৎসেনা বলল, সে রকম বিপদ নয়, আমি ভাবছি আপনার সম্মানহানির কথা। হে মানময়ী, রাজাদের দ্যূত-নেশার বিষয়ে আমি কিছু কিছু জানি। পূর্বে এমন ঘটেছে যে আত্মাভিমানী কোন কোন রাজা অক্ষক্রীড়ায় পর্যুদস্ত হয়ে উন্মত্তবৎ হয়ে গেছেন। তখন সেই রাজগণের শুভ-অশুভ জ্ঞান থাকে না। তাঁরা সমুদয় রাজ্য পর্যন্ত বাজি রাখেন। এবং সেই বাজিও হারলে তাঁরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজের প্রিয়তমা মহিষী এবং পুত্রকন্যাদেরও বাজি ধরেন।

দময়ন্তী কান্না থামিয়ে বিস্ফারিত নেত্রে পরিচারিকার দিকে তাকালেন।

বৃহৎসেনা বলল, হে রাজ্ঞী, আমি সত্য কথাই বলছি। এ রকম ঘটেছে আমি জানি*। মহারাজ নলও সেই পথেই যে চলেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন অংশ বাজি ধরছেন এবং হারছেন। তাঁর শেষ বাজি হবেন আপনি।

কম্পিত কলেবরে দময়ন্তী বললেন, বৃহৎসেনা, তুমি যা বললে তা যদি সত্য হয়, তবে এখন আমি কী করব বল। দ্যূতপণে পরহস্তগত হবার আগে আমি নিশ্চিত প্রাণত্যাগ করব। তুমি আমায় বিষ এনে দেবে?

অতীব বুদ্ধিশালিনী এবং প্রভু অনুরক্তা বৃহৎসেনা বলল, আপনি প্রাণ ত্যাগ করলেও আপনার সন্তান দুটি থাকবে। সুতরাং ও চিন্তা ত্যাগ করুন। সত্বর অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমি বলি কী, সেই চরম মুহূর্তটি আসবার আগেই আপনি পুত্র-কন্যাসহ পিত্রালয়ে চলে যান। আমি সারথিকে ডাকছি।

দময়ন্তী বলল, পিত্রালয়ে চলে যাব? মহারাজের অনুমতি নিতে হবে না?

বৃহৎসেনা বলল, মহারাজের এখন মতিস্থির নেই, এই সময় কী ভাবে এবং কে অনুমতি আনতে যাবে? আপনি শীঘ্র যাত্রা করুন। পরে সুসময় এলে মহারাজ নল নিশ্চয়ই আপনাকে ফিরিয়ে আনবেন।

বৃহৎসেনা পরমুহূর্তেই ছুটে গিয়ে মহারাজ নলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সারথি ঋতুপর্ণকে ডেকে নিয়ে এলো।

দময়ন্তী তাঁকে বললেন, সূত, রাজা সর্বদা তোমার সঙ্গে যে-রূপ সদয় ব্যবহার করেছেন, তা তুমি জানো। এখন প্রভুর দুর্দশার সময় কি তুমি সর্বতোভাবে সাহায্য করবে না?

প্রভুভক্ত ঋতুপর্ণ সসম্ভ্রমে বলল, হে রাজ্ঞী, প্রভুর সর্বপ্রকার সেবার জন্য আমি যে কায়মনবাক্যে সবসময় নিযুক্ত আছি, সে বিষয়ে কোন সংশয় রাখবেন না। এখন কী আজ্ঞা, বলুন।

তখন বৃহৎসেনাই বুঝিয়ে দিল যে রথে অতি দ্রুতগামী অশ্ব সংযোজিত করে অবিলম্বেই পুত্র কন্যাসহ দময়ন্তীকে এ রাজ্য পার করে নিরাপদ কোন স্থানে পৌঁছে দিতে হবে।

---

* বৃহৎসেনা এখানে কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টান্ত দিচ্ছে না। পাশাখেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে যুধিষ্ঠির নিজের ভাইদের এমন কি দ্রৌপদীকেও বাজি ধরেছিলেন এর অনেক পরে। বৃহৎসেনা বলছে অন্য কারোর কথা।

রাজা নলের অজ্ঞাতসারে তাঁর পত্নী ও সন্তানদের নিয়ে যেতে হবে শুনে ঋতুপর্ণ দ্বিধা করতে লাগল। সে রাজার নিজস্ব সারথি, রাজার আদেশ ছাড়া কখনও সে রথের রশি হাতে নেয়নি।

দময়ন্তী ও বৃহৎসেনার পুনঃ পুনঃ সনির্বন্ধ উপদেশ শুনে সে বিচলিত হল এবং একবার ছুটে বাইরে এসে অপেক্ষমান মন্ত্রী ও পৌরজনের কাছে পরামর্শ চাইল। তাঁরাও সকলে একবাক্যে বললেন, এখুনি সম্মানীয়া দময়ন্তীকে পুত্রকন্যাসহ নিষধরাজ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়াই কর্তব্য।

আর বিন্দুমাত্র কাল হরণ না করে ঋতুপর্ণ রথ প্রস্তুত করে আনলেন। পুত্র ইন্দ্রসেন এবং কন্যা ইন্দ্রসেনার হাত ধরে একবস্ত্রা দময়ন্তী রাজপুরী থেকে বেরিয়ে এসে সেই রথে উঠতেই ঋতুপর্ণ ঘর্ঘর শব্দে চালিয়ে দিলেন রথ।

এদিকে ধাত্রী বৃহৎসেনা যেমন বলেছিল, সেই রকমই হল। রাজা নলকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে দেবার পর বিদ্রূপের অট্টহাস্যে পুষ্কর বললেন, হে ভূতপূর্ব রাজা, আপনার দ্যূতক্রীড়ার সখ মিটেছে? আমার কিন্তু এখনো মেটেনি। এবার শেষ বাজি ধরুন।

সর্বরিক্ত হয়ে যাবার পর নলের মন থেকে ক্রোধ বা দুঃখ অন্তর্হিত হয়ে এক অদ্ভুত উদাসীনতা এসে ভর করেছে। তিনি শান্ত ভাবে বললেন, বাজি ধরবার মতন আর কিছু নেই।

পুষ্কর তীক্ষ্ন কণ্ঠে বললেন, কে বলেছে নেই? সর্বাঙ্গে ঐশ্বর্যশালিনী, সুন্দরী শ্রেষ্ঠা দময়ন্তী তো রয়েছেন, এবার তাঁকে পণ করুন। আপনি দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় আমায় যেতে দেননি, আজ তার শোধ নেব। কথা দিচ্ছি, দময়ন্তীকে যদি আমি এখনো পাই তা হলে এই রাজ্যের এক চতুর্থাংশ আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেব।

এমন অশিষ্ট কটুক্তি শুনেও রাজা নল ক্রোধে জ্বলে উঠলেন না। পুষ্করের কথার কোন উত্তরও দিলেন না তিনি। ধীরে ধীরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের অঙ্গ থেকে অলঙ্কারগুলি খুলে ফেলে দিতে লাগলেন মাটিতে। তারপর শুধুমাত্র এক বস্ত্র সম্বল করে তিনি সেই কক্ষ থেকে এবং রাজপ্রাসাদ থেকেও বেরিয়ে গেলেন এবং পদব্রজে চললেন রাজ্য ছেড়ে। শোক বিমূঢ় প্রজাগণ নিস্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল তাঁকে। স্বেচ্ছায় তিনি রাজ্য বঞ্চিত হয়েছেন, কেউ তাকে ফেরাতে পারবে না।

দময়ন্তীর রথ তখন সবেমাত্র কিছু দূরে গেছে। দূর থেকেই তিনি দেখতে পেলেন তাঁর স্বামী নল পদব্রজে বেরিয়ে পড়েছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি সারথি

ঋতুপর্ণকে বললেন, হে সূত, থামাও, থামাও, শীঘ্র থামাও !

ঋতুপর্ণ বিস্মিত ভাবে রথ সংযত করতেই দময়ন্তী বললেন, হে সূত, এক্ষণে আমি তোমার শরণাপন্ন হলাম। আমার স্বামী রাজ্যচ্যুত হয়ে একাকী চলে যাচ্ছেন, এই অবস্থায় আমি তাঁকে কিছুতেই ছেড়ে যেতে পারি না। ধর্মসাক্ষী করে আমি আমার পুত্র-কন্যাদের সমর্পণ করলাম তোমার হাতে। তুমি তাদের ভীমনগরে নিয়ে যাও। তুমি ওদের আমার আত্মীয় স্বজনদের নিকট নিরাপদে পেঁছে দিলে আমার আশীর্বাদ সর্বদা তোমার মস্তকে বর্ষিত হবে।

এই বলে দময়ন্তী লম্ফ দিয়ে রথ থেকে নেমে ছুটে চললেন নলকে ধরবার জন্য। অচিরেই তিনি নলের সমীপবর্তী হয়ে তাঁর হাত ধরে বললেন, হে নাথ, আমাকে ছেড়ে আপনি কোথায় চলেছেন ?

## ॥ পাঁচ ॥

রাজা হয়েই পুষ্কর হুকুম জারি করলেন যে প্রজাদের মধ্যে যদি কেউ নলকে সাহায্য করে কিংবা নলের পক্ষ নিয়ে কোন কথা বলে, তা হলে তার প্রাণদণ্ড হবে। পুষ্কর স্বয়ং সৈন্য সামন্ত সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে লাগলেন। প্রজারা ভীত হয়ে কেউ আর নলের কথা উচ্চারণ করল না। নিষধ দেশ থেকে রাজা নলের নাম মুছে গেল।

দময়ন্তীকে সঙ্গে নিয়ে নল আশ্রয় নিলেন রাজ্যের সীমান্তের বাইরে এক গভীর অরণ্যে। প্রথম তিনদিন তাঁদের কাটল অনাহারে, শুধু জল পান করে। এই বন অতি ভয়াল, স্বাপদসঙ্কুল, এখানে ক্ষুন্নিবৃত্তি করাও কঠিন। ফল মূলের সন্ধানে বাধ্য হয়েই নলকে প্রবেশ করতে হল আরও ভিতরে, দময়ন্তীও তাঁর অনুগামিনী হলেন।

তেমন ফল-মূলও জোটে না। নল সঙ্গে কোন অস্ত্রও আনেননি বলে শিকার করতেও পারেন না, অল্পাহারে তাঁদের শরীর দিন দিন ক্ষীণ হয়ে এল।

একদিন নল দেখলেন একটি ছায়া সুশীতল, মনোরম স্থানে এক ঝাঁক হংস বসে আছে, তাদের প্রত্যেকেরই একটি করে পালক সোনার। হংসগুলি দেখে নল মনে মনে চিন্তা করলেন, এদের যদি ধরতে পারি, তাহলে খাদ্যেরও সংস্থান হবে এবং সুবর্ণ পালকগুলি পেলে তাঁর হাতেও কিছু সম্পদ আসবে আবার।

হংসগুলিকে বন্দী করার জন্য নল এক বৃক্ষের আড়ালে লুক্কায়িত থেকে নিজের পরিধেয় বস্ত্রটি খুলে জাল ফেলার মতন ছুঁড়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে হংসের দল সেই বস্ত্রটি নিয়েই আকাশে উড়ে গেল। তাদের দলপতিটি উড্ডীয়মান অবস্থায় নিম্নে দিগম্বর, দীনহীন ও অধোমুখ নলকে উদ্দেশ্য করে বলল, হে অবোধ জুয়াড়ী, তুমি নিজ দোষে সব কিছু হারিয়েছ, এখন আমরা তোমার শেষ সম্বলও দিয়ে প্রস্থান করছি। তুমি যে রাজা ছিলে, তার আর কোন চিহ্নই রইল না!

দময়ন্তী গিয়েছিলেন নদীতে স্নান করতে। খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে তিনি নলকে সম্পূর্ণ দিগম্বর এবং মুহ্যমান অবস্থায় এক বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। ছুটে এসে তিনি ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এমন দশা কেমন করে হল, নাথ?

নল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আর কী বলব! এক হংস তোমার সংবাদ জানিয়ে আমার সৌভাগ্য এনে দিয়েছিল, আবার এক হংসের দল আমার দুর্ভাগ্যের দশা পূর্ণ করে দিয়ে গেল!

দময়ন্তীও এক বসনে রাজপুরী ছেড়ে এসেছিলেন। দ্বিতীয় কোন বস্ত্রের অভাবে তিনি তাঁর সিক্ত বসনই অর্ধেকটা খুলে স্বামীর শরীরে জড়িয়ে দিলেন।

যমজ নারী-পুরুষের মতন পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে রইলেন নল ও দময়ন্তী।

সেই অবস্থায় পথ চলা দুষ্কর। ফল আহরণের আর প্রবৃত্তি হল না নলের। সেই বৃক্ষতলেই তাঁরা শুয়ে পড়লেন।

নল জিজ্ঞেস করলেন, তোমার শরীরে কি ক্রোধ নেই, দময়ন্তী? আজন্ম সুখ ভোগে লালিত তোমাকে আমি এমন অবস্থায় এনে ফেলেছি যে লজ্জা নিবারণের জন্য তোমার একটি সম্পূর্ণ বস্ত্রও নেই, তবু তো তুমি আমায় একবারও দুর্বাক্য বললে না?

দময়ন্তী ঈষৎ হেসে বললেন, অবস্থার এই অভিনবত্বে আমি বেশ আনন্দই পাচ্ছি। রাজপুরীতে জীবন বড় বৈচিত্রহীন হয়ে পড়েছিল।

নল বললেন, হুঁ। উত্তম খাদ্যে মাঝে মাঝে অরুচি আসে, তখন এক দিনের অনাহারও সুখপ্রদ হয়। কিন্তু দিনের পর দিন যদি আর খাদ্য না জোটে, সেটাও অভিনবত্ব?

দময়ন্তী বললেন, তখন আপনি যেমন ভাবে সহ্য করবেন, আমিও সেই ভাবে সহ্য করব।

নল বললেন, যদি হঠাৎ বনের মধ্যে অন্য কোন মানুষ এসে পড়ে, তখন তাদের সামনে আমরা দুজনে এই অবস্থায় দাঁড়াতে পারব? এক বস্ত্রে দুজনে বাঁধা! কিংবা বন্য পশুর মতন, বা কুষ্ঠরোগীর মতন আমরা মানুষ দেখলেই লুক্কায়িত হয়ে পড়ব?

দময়ন্তী বললেন, আপনি অত চিন্তা করছেন কেন। আগে সে রকম ঘটনা ঘটুক, তখন আমরা বিবেচনা করে দেখব।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নল আকাশ দর্শন করতে লাগলেন। নলের প্রসারিত এক বাহুর ওপর দময়ন্তী মাথা রেখেছেন।

তারপর নল আপন মনে বললেন, অরণ্যের বড় বড় বৃক্ষগুলির মাথা ছাড়িয়েও দেখা যাচ্ছে এক পর্বত শৃঙ্গ। ঐটিই বিন্ধ্য পর্বত। ঐ পর্বতের পাদদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে এক সমুদ্রগামী নদী। সেখানে রয়েছে অনেক সিদ্ধ



যোগীদের আশ্রম। বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চাত ভূভাগকে বলে দক্ষিণাপথ। আর ঐ নদীর পার্শ্ব ধরে গেলে কোশলে পেঁছিনো যায়। আর একটি পথ গেছে অবন্তী নগর ও ঋক্ষবান পর্বতের দিকে। সেই পথ ধরেই উত্তীর্ণ হওয়া যায় বিদর্ভ নগরে।

দময়ন্তী চুপ করে শুনছিলেন। বিদর্ভ নগরের নাম শুনে তিনি সচকিত

হয়ে বললেন, আপনি আমার পিতার রাজ্যের পথ চেনেন ? চলুন না, তা হলে আমরা সেখানে যাই ? আমি ঠিকই জানি, সেখানে একবার পৌঁছতে পারলে পিতা আমাদের পরম আহ্লাদের সঙ্গে গ্রহণ করবেন। আপনাকে তিনি সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করবেন রাজসভায়।

হঠাৎ যেন রেগে উঠে নল বললেন, ভীমসেন-পুত্রী, তুমি কী বললে ? এই অবস্থায় আমি যাব তোমার পিতার রাজ্যে ? একদিন যেখানে গেছি চতুরঙ্গ সেনা সঙ্গে নিয়ে, আমার রথের শীর্ষে স্বর্ণ পতাকা উড়িয়ে, আজ আমি সেখানে যাব এমন দীন হীন ভিখারীর মতন ? দময়ন্তী, দ্যূত-পণে আমি সব হারিয়েছি, কিন্তু আত্মগরিমা হারাইনি।

দময়ন্তী পাশ ফিরে নলের বক্ষে হাত রেখে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন।

তবে তুমি আমায় বিদর্ভ নগরীতে যাবার প্রস্তাব দিলেন কেন ?

দিতাম না! কিন্তু আপনি অকস্মাৎ বিদর্ভ নগরের পথ নির্দেশ করতে শুরু করলেন কেন ?

সে শুধু তোমার জন্য।

আমার জন্য ? আপনি কি মনে করেন, আপনাকে এখানে একা ফেলে আমি পিতৃরাজ্যে ফিরে ফিরে গিয়ে সুখ ভোগ করব ? রাজা, আপনি এমন কথা বলতে পারলেন আমাকে ?

আমি আর রাজা নই, কেন লজ্জা দিচ্ছ, দময়ন্তী।

আপনি সব সময়েই আমার হৃদয়ের রাজা থাকবেন।

হে মালিনী, শোন, বুদ্ধি দোষে আমি শ্রীভ্রষ্ট হয়েছি, কিন্তু তার ফল তুমি কেন ভোগ করবে শুধু শুধু। এই বন্য জীবন তোমার সহ্য হবে না। ভবিষ্যতের দিকেও কোন আশা নেই, সেইজন্যই বলছি, তুমি তোমার পিতৃরাজ্যে গমন কর।

কখনোই না! দেবতাদের ফেলে আমি আপনার কণ্ঠে বরমাল্য দিয়েছিলাম দুঃসময়ে আপনাকে পরিত্যাগ করবার জন্য ?

উঠে বসে তেজের সঙ্গে দময়ন্তী বললেন, আপনি কি আমায় এমনই স্বার্থ-পরায়ণা মনে করেন ? আপনি যে কষ্ট সইতে পারবেন, তা আমি পারব না ? আমার জন্ম কি শুধু আদরিনী হবার জন্য, আপদে-বিপদে সঙ্গিনী হবার যোগ্যতা আমার নেই ? নারী হয়েছি বলে কি শুধু পুরুষের বিলাসের সামগ্রী হয়ে থাকব, সংকটে দুঃখভাগিনী হতে পারব না ?

নল তখন দময়ন্তীকে শান্ত করার চেষ্টায় বললেন, আত্ম সংবরণ কর দময়ন্তী, অত উত্তেজিত হয়ো না। আমি সেভাবে তোমায় ফিরে যাবার কথা বলি নি। আমি বলেছিলাম, এ দুর্ভাগ্য আমার স্বেচ্ছাকৃত, তোমার কোন দোষ নেই, এমন কি তুমি নিষেধ করলেও আমি শুনিনি। সেইজন্যই তোমাকে কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছে করে না।

দময়ন্তীর চক্ষে অশ্রু এসে গেল এবার। বাষ্পাকুল কণ্ঠে তিনি বললেন, এমন অবস্থায় আপনাকে ছেড়ে গেলে সেই হবে আমার মৃত্যুর অধিক শাস্তি। আপনি আর ও কথা মনে স্থান দেবেন না একবারও। কষ্ট সহ্য করাই সবচেয়ে কঠিন। দুজনে মিলে ভাগ করে নিলে অনেক দুঃখই আর দুঃখ বলে মনে হয় না। নাথ, আপনি আমাকে কখনো ছেড়ে যাবেন না।

নল বললেন, না না, সে কথা ওঠেই না। তোমার ঐ নির্মল জ্যোৎস্না-লোকিত মুখখানিই আমার সকল দুঃখে সান্ত্বনা-স্বরূপ হবে। আমি বরং আত্মকে পরিত্যাগ করতে পারি, কিন্তু তোমার বিরহে ক্ষণমাত্র জীবিত থাকব না।

দময়ন্তী বললেন, আপনি আমায় শক্ত করে আঁকড়ে ধরুন।

নল দময়ন্তীকে আলিঙ্গন করে বহু প্রকার প্রবোধ বাক্য বলতে লাগলেন।

এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন দময়ন্তী।

কিন্তু নলের চক্ষে কিছুতেই নিদ্রা এলো না। তাঁর চিত্তের মধ্যে অসংখ্য তরঙ্গ বিক্ষোভ চলেছে। শুয়ে শুয়ে তিনি আকাশ পাতাল চিন্তা করতে লাগলেন। এই ভাবে দিন কাটবে কী করে? এই বনে আর বেশী দিন বাস করলে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করতে হবে। লোকালয়ে গেলে অনেকেই তাঁকে চিনে ফেলবে। আর দময়ন্তী সঙ্গে থাকলে তো কথাই নেই। এমন রূপবতী রমণী দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সকলেরই। দুটি সন্তানের জননী হলেও দময়ন্তী যেন স্থিরযৌবনা।

লোকালয়ে গিয়েও তো ভিক্ষার দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন করা সম্ভব নয়। কারুর দয়া বা করুণাও তিনি গ্রহণ করতে পারবেন না, রাজরক্ত রয়েছে তাঁর শরীরে। লুব্ধ পুরুষদের চক্ষু থেকে দময়ন্তীকে তিনি রক্ষা করবেনই বা কী ভাবে!

নলের বার বার মনে হতে লাগল, দময়ন্তী যা-ই বলুক এ সময় পিত্রালয়ে গিয়ে থাকাই তার পক্ষে সঙ্গত। যদি পুনর্বার ভাগ্য ফেরাতে হয়, তাহলে নলকে একাই চেষ্টা করতে হবে।

নিজের দিকে একবার তাকালেন তিনি। এভাবে কী আর একটি দিনও

চলে ? নিজের পত্নীর শরীরের সঙ্গে লিপ্ত থেকে কোন পুরুষ পরিভ্রমণ করতে পারে ? একটিমাত্র বসনে দময়ন্তীর সঙ্গে তিনি বাঁধা। সত্যই তো, বনের মধ্যে হঠাৎ কোন মানুষ যদি এসে পড়ে তবে তার সামনে তাঁরা দুজনে দাঁড়াবেন কী করে ? অন্যের বিদ্রূপ উপহাস সহ্য করতে হবে তাঁদের।

দময়ন্তীর মস্তকের তলা থেকে আস্তে আস্তে নিজের বাম বাহু সরিয়ে নিয়ে এলেন নল। তারপর তাঁদের দুজনের মাঝখানের বসন ধরে সবলে টান দিতেই সেই রেশমী বসন দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।

পরক্ষণেই নল ভাবলেন, ছি ছি, এ কী করলেন তিনি! দময়ন্তীর টুকরোটিতে যে তাঁর শরীরের সর্বঅঙ্গ ঢাকা পড়ছে না! তবু দুজনে পাশা-পাশি থাকায় কোনক্রমে কাজ চলছিল, এখন যে আরও খারাপ হল! নিজের বসন হংসে নিয়ে গেছে এখন তিনি দময়ন্তীর বসনও ছিন্ন করলেন!

উঠে দাঁড়ালেন নল। এবার তাঁকে যেতেই হবে। বিদর্ভ রাজ্যের পথ নির্দেশ করে দিয়েছেন তিনি, দময়ন্তী নিশ্চয় কোনক্রমে পেঁৗছে যেতে পারবে সেখানে। কিন্তু তার পথ হবে অন্য।

কয়েক পা চলে গিয়ে নল আবার থমকে দাঁড়ালেন। হিংস্র ব্যাঘ্র-হস্তী পরিপূর্ণ এই অরণ্যে প্রিয়তমা পত্নীকে ফেলে যাচ্ছেন তিনি। তাঁর কি মতিভ্রম হয়েছে ?

দ্রুতপদে আবার ফিরে এসে তিনি দময়ন্তীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন। দময়ন্তীকে সঙ্গে নিয়ে এই অরণ্য পার করে নগরপ্রান্তে পেঁৗছে দিয়ে তারপর তাঁর বিদায় নেওয়া। এমন অসহায় ভাবে দময়ন্তীকে কিছুতেই ফেলে যাওয়া যায় না।

খুব সন্তর্পণে দময়ন্তীর নাসিকার কাছে হাত রাখলেন তিনি। দময়ন্তীর সমান ভাবে নিশ্বাস পড়ছে। পথশ্রমে এবং অনাহারজনিত দুর্বল শরীরে দময়ন্তী গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন।

নল আবার ভাবলেন, জেগে ওঠার পর দময়ন্তীকে অরণ্য পার করে দেবার প্রস্তাব দিলে তিনি কিছুতেই মানবেন না। দুঃখ সহনের বিলাসিতা ভোগ করতে চাইছেন দময়ন্তী। রাজনন্দিনী এবং রাজমহিষী হয়েও যে তিনি ভূমিশয্যা এবং অনিশ্চিত আহার সহ্য করতে পারেন, স্বামীকে তা দেখাতে চান। কিন্তু নল পুরুষ, নষ্ট রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি যদি আজীবন চেষ্টা না করেন, তাহলে তাঁর পুরুষকার ব্যর্থ।

দময়ন্তীর পার্শ্ব ছেড়ে নল আবার একটু দূরে সরে এলেন। এ দুর্বলতা দমন করতেই হবে। অসামান্যা রূপসী হলেও দময়ন্তী মোটেও অবলা নন,

তিনি যথেষ্ট তেজস্বী, নিজের পথ তিনি খুঁজে নিতে পারবেন ঠিকই।

আরও কিছুটা দূরে চলে এসে একটি বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়িয়ে দময়ন্তীর মুখ নিরীক্ষণ করতে লাগলেন নল। জেগে উঠে তাঁকে না দেখতে পেয়ে দময়ন্তী কী করবেন? যদি শোকে-দুঃখে উন্মাদিনী হয়ে যান! না না, তেমন হতে পারে না কিছুতেই। অত দুর্বল মন নয় দময়ন্তীর। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন এই যে অকস্মাৎ রাজ্য গেল, সব গেল, তবু তো একটাও অভিযোগ-বাক্য বলেননি দময়ন্তী। একবারও নলকে গঞ্জনা দেননি। এ কী সর্বনাশ করলেন, নাথ? স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কথাও একবারও চিন্তা করলেন না? আমি তো নিবৃত্ত করতে গিয়েছিলাম আপনাকে—

কেন দময়ন্তী বলেননি এ সব কথা? দময়ন্তী দু'চারবার ধিক্কার দিলে নল তা নতমস্তকে মেনে নিতেন। সেটাই ছিল স্বাভাবিক। তার বদলে দময়ন্তী এমন ভাব করে আছেন যেন কিছুই ঘটেনি। এমন কি মুখের হাসিটিও মিলিয়ে যায় নি তাঁর। দময়ন্তীর ঘুমন্ত ওষ্ঠেও লেগে আছে হাসির রেখা। মোহগ্রস্ত স্বামীকে অন্তরে অন্তরে কিছুটা করুণা করেন দময়ন্তী? নলের কর্মদোষকে তিনি কৃপার চক্ষে মেনে নিয়েছেন।

এই কথাগুলি মনে আসা মাত্র নলের শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠল। তিনি আর বিলম্ব করলেন না। শেষবার দুই চক্ষু ভরে দময়ন্তীকে দেখে নিয়ে তিনি পশ্চাতে ফিরে দ্রুত ছুটতে লাগলেন। যেদিকে বিদর্ভ নগর তার বিপরীত দিকে তিনি মিলিয়ে গেলেন গহন অন্ধকার বনে।



॥ ছয় ॥

কয়েক দণ্ড পর নিদ্রা ভাঙলে দময়ন্তী নিজ পার্শ্বে নলকে দেখতে পেলেন না। তারপর দেখলেন তাঁর বসন কর্তিত। তবু তিনি বিশেষ বিচলিত হলেন না।

উঠে বসে, কেশদাম সুবিন্যস্ত করতে করতে তিনি তাঁর ঘুমের আবেশমাখা অপরূপ মুখখানি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন চতুর্দিকে।

দময়ন্তী ভাবলেন, নল কাছাকাছি কোথাও লুক্কায়িত থেকে তাঁর সঙ্গে কৌতুক করছেন। তিনি বীণা ঝঙ্কারের মতন সুমধুর কণ্ঠে বলে উঠলেন, নাথ, আমি আপনাকে দেখতে পেয়েছি। ঐ তো শালতরুর পাশটিতে দেখা যাচ্ছে আপনার গৌরবর্ণ সুঠাম বাহু!

তবু নল বেরিয়ে এলেন না। দময়ন্তী যাকে নলের বাহু বলে মনে করেছিলেন, তা আসলে বৃক্ষেরই একটি শাখার অংশ।

দময়ন্তী উঠে দাঁড়িয়ে এদিকে ওদিকে খুঁজে দেখলেন খানিক। তারপর তিনি আবার উচ্চস্বরে বললেন, নদীতীরে একটি বৃক্ষে কয়েকটি সুপক্ক ফল দেখে এসেছি, আমি এখন সেই ফল আহরণ করতে যাচ্ছি, আপনি আমার সঙ্গে আসবেন তো আসুন!

নদীর দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হয়েও দময়ন্তী আবার পিছন ফিরে তাকালেন। কই, কেউ তাঁকে অনুসরণ করে আসছে না তো!

দময়ন্তী আবার বললেন, সেই বৃক্ষের ফলবান শাখাটি বড় উচ্চে, আমি নাগাল পাব না। আপনি না এলে সেই ফলবান শাখা আমার অনধিগম্য থেকে যাবে!

তবু নলের সাড়া নেই।

এবার দময়ন্তী কৃত্রিম ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন, ওরে বাপরে! কে কোথাও আছ, আমায় বাঁচাও, এক বিশাল অজগর সাপ আমায় গ্রাস করতে আসছে!

দময়ন্তীকে রক্ষা করবার জন্য ছুটে এলো না কেউ!

এতক্ষণে দময়ন্তীর মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। তিনি কাল্পনিক সর্পের কথা বলেছেন বটে কিন্তু তাঁর আর্ত চিৎকার শুনে তো নল ছুটে না এসে পারেন না!

দুটি হাত যুক্ত করে দময়ন্তী বললেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, স্বয়ংবর সভায় আপনি

শপথ করেছিলেন যে ইহজীবনে আমাকে কখনো পরিত্যাগ করবেন না। আমি জানি, সে শপথ আপনি ভাঙতেই পারেন না। তবে কেন এই অধীনার সঙ্গে ছলনা করছেন ? দিবাকর অস্তগামী হয়েছেন, একটু পরেই সন্ধ্যা নেমে আসবে। এই সময় এই ভয়াল বনে আমি একা কী করে থাকব ?

এবারেও উত্তর না পেয়ে দময়ন্তী ভয়চকিতা হয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে লাগলেন। নল তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন, এ তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না। অনেকক্ষণ খুঁজেও তিনি নলের সন্ধান না পেয়ে মনে করলেন, কোন বিশেষ কারণে নলকে অন্যত্র যেতে হয়েছে, হয়তো কেউ সবলে নলকে ধরে নিয়ে গেছে। সুতরাং অনুসন্ধান করতে হবে দময়ন্তীকেই।

কিন্তু তিনি কোন্ দিকে যাবেন ? নল তো কোন চিহ্নও রেখে যাননি। দিকশূন্য ভাবে ছুটতে লাগলেন দময়ন্তী।

অন্ধকার নেমে আসায় সেই কানন ভীষণ রূপ ধারণ করল। শোনা যেতে লাগল অসংখ্য ঝিল্লিরব, তার মধ্যে মধ্যে ব্যাঘ্রের গর্জন, হস্তীর বৃংহতি, কখনও বা সিংহ-আক্রান্ত হরিণের করুণ আর্তনাদ। দময়ন্তী সে-সব কিছুই গ্রাহ্য করলেন না। তিনি শুধু কোথা নল, কোথা নল বলে হাতড়াতে লাগলেন অন্ধকারের মধ্যে।

বহুক্ষণ দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে এক সময় দময়ন্তী প্রায় মূর্ছিতের মতন অবস্থায় পড়ে গেলেন একখণ্ড পাথরের ওপর। সেই অবস্থায় জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে তিনি বললেন, হায় মহারাজ, তুমি শেষ পর্যন্ত আমার কাছে মিথ্যাবাদী হলে ?

সেই শিলাতটে খানিকক্ষণ বসে বিশ্রাম নেবার পর দময়ন্তী দেখলেন অন্ধকারের মধ্যে দুটি জ্বলন্ত হলুদ চক্ষু এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে।

তিনি প্রশ্ন করলেন, কে ?

কোন উত্তর না দিয়ে চক্ষু দুটি এগিয়ে আসতেই লাগল। আরো কাছে আসবার পর দময়ন্তী বুঝতে পারলেন সেই চক্ষু দুটি এক বিশালাকার সিংহের। এমন সুলভ শিকারটি দেখে তাঁকে গ্রাস করতে আসছে।

দময়ন্তী পলায়ন বা আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করলেন না। সিংহটির চক্ষে চক্ষু স্থাপন করে তিনি বললেন, হে মৃগরাজ, তুমি সমস্ত পশুদের প্রভু, এবং এই কাননের অধিপতি। তোমার কাছে আমি আর এক রাজার সন্ধান চাইছি। আমিও এক রাজকন্যা এবং রাজমহিষী। আমার প্রভুর নাম নল। তুমি কি তাঁকে এই বনের কোন স্থানে দেখেছ ? হয় তুমি তাঁর সন্ধান দিয়ে আমার জীবন রক্ষা কর, নয় তো আমায় এখনি ভক্ষণ করে আমার সব দুঃখ ঘুচিয়ে দাও !

বনের সিংহ এ কথায় কী বুঝল কে জানে ? সে কোনও শব্দও করল না, দময়ন্তীকে আক্রমণ করতেও এলো না, মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

দময়ন্তী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হায়, এই সিংহও আমাকে জীবিত থাকতে কিংবা মৃত্যুবরণ করতে কোনরূপ সাহায্য করল না।

এবার তিনি চেয়ে দেখলেন, যে শিলাখণ্ডে তিনি বসে আছেন, তার পাশেই একটি অশোক বৃক্ষ। আর সকল বৃক্ষের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে সে।

তখন দময়ন্তী সেই অশোক বৃক্ষকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে তরুরাজ, তুমি আমার শোক অপনোদন করে সার্থকনামা হও। তুমি কি দময়ন্তীর প্রাণপতি নিষধরাজ নলকে দেখেছ ? তাঁর সুকুমার অঙ্গ অর্ধবসনে আচ্ছাদিত। তোমার গ্রীব উচ্চ, তুমি একটু চেষ্টা কর না, তাঁকে কোথাও দেখতে পাও কি না। হে অশোক, তুমি আমায় বিগত-শোক কর।

অশোক বৃক্ষও নিরুত্তর রইল।

এরপর দময়ন্তী আবার উঠে পড়ে নল-অন্বেষণে ব্যাপৃত হলেন। তিনি পর্বতের কাছে, নদীর কাছে, ফুলের কাছে কাতর ভাবে বারবার নলের সন্ধান জানতে চাইলেন। কেউ তাঁকে কিছুই বলল না।

এক সময় তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে।

তাঁর যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন পূর্ব দিগন্তে রক্তবর্ণ সূর্য সবেমাত্র উঁকি দিয়েছে, বৃক্ষ চূড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে নরম আলো।

দময়ন্তী প্রথমে স্মরণ করতে পারলেন না তিনি কোথায়। তারপর তিনি খুব জোরে ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি দেখলেন, এক প্রকাণ্ড অজগর তাঁকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধরেছে।

আগের দিন দময়ন্তী কাল্পনিক অজগরের জন্যই চিৎকার করে নলকে আহ্বান করেছিলেন, আজ সত্যকারের প্রাণঘাতী সর্পকে দেখেও তিনি কারুর সাহায্য চাইলেন না। বরং সেই কাল ভুজঙ্গের ব্যাদিত মুখের দিকে নিজের মাথাটা বাড়িয়ে দিলেন দময়ন্তী।

ঠিক সেই সময়েই কোথা থেকে একটি তীক্ষ্ন তীর এসে বিদ্ধ হল অজগরটির দুই চক্ষুর ঠিক মাঝখানে। তারপর একজন সুদর্শন, বলশালী ব্যাধ ছুটে এসে ধারালো খড়্গ দিয়ে অজগরটির দেহে প্রচণ্ড আঘাত করতে লাগল।

অজগরটিকে হত্যা করে সেই ব্যাধ দময়ন্তীর প্রাণ রক্ষা করল। দময়ন্তী তখন অচেতন। ব্যাধটি জলাশয় থেকে পদ্মপাতায় জল নিয়ে সিঞ্চন করতে লাগল দময়ন্তীর চোখে মুখে।

ব্যাধটি এই অরণ্যে প্রায়ই আসে। কখনও সে এমন একাকিনী, অনিন্দ্য-সুন্দর নারীকে এখানে দেখেনি, তার মনে হল এই নারী কখনও সামান্য মানবী হতে পারে না।

দময়ন্তী চক্ষু উন্মীলন করলে ব্যাধটি কৃতাঞ্জলি হয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলল, এই বিজন বনে আপনি কেন এসেছেন ? আপনি কার ঘরণী বা কার বালা ? আপনি দেবী না অপ্সরা ? অথবা কোন দানব-নন্দিনী ?

দময়ন্তী ধীর স্বরে বললেন, আমি নিতান্তই মানবী এবং অতি অভাগিনী।

মানবী শুনেই সেই ব্যাধের দৃষ্টির ভাব বদলে গেল। এবার সে লোভের চক্ষে দেখল দময়ন্তীকে।

উদ্ভিন্নযৌবনা দময়ন্তীর শরীর-বল্লরী ছিন্ন বসনে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েনি। দময়ন্তীর উন্নত শ্রোণী, পীন পয়োধর, মৃণাল ভুজ, রসাল ওষ্ঠ এবং পারিজাত কুসুম সদৃশ মুখমণ্ডল দেখে সেই ব্যাধ মদন-বশীভূত হয়ে বলল, হে মৃগনয়না তোমার আর কোন ভয় নেই, তুমি কেন অভাগিনী হবে, আমি তোমায় পরম সমাদরে রাখব।

ব্যাধের সহসা ব্যবহার পরিবর্তনে দময়ন্তী সন্দিহান হয়ে তার দিকে খর চক্ষে তাকালেন।

ব্যাধ বলল, এ বেশ ভালই হল। নিজ গৃহে আমার পুরাতন পত্নী আছে, সে থাক। এই বনের মধ্যে আমি তোমার জন্য একটি উত্তম কুটির বানিয়ে দেব, সর্বোৎকৃষ্ট মাংস শিকার করে আনব তোমার জন্য। আমি পরিশ্রান্ত হয়ে এলে তুমি আমার সেবা করবে। রতিসুখ সম্ভোগে আমরা দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করে তুলব। এখন আমার বক্ষে এসো—।

এই কথা বলে ব্যাধ দময়ন্তীর দিকে লালসাময় একটি হাত বাড়াতেই দময়ন্তী দ্রুত পিছনে সরে গিয়ে তেজের সঙ্গে বললেন, নরপশু, আমায় ছুঁবি না !

ব্যাধের মুখে বাঁকা হাস্য ফুটে উঠল। সে কুটিল কণ্ঠে বলল, সুন্দরী, আমি তোমার জীবন রক্ষা করেছি, এখন তোমার ওপরে আমারই সম্পূর্ণ ন্যায্য অধিকার, সুতরাং তুমি আপত্তি করছ কেন ?

আরও একটু পিছিয়ে গিয়ে দময়ন্তী বললেন, মর্কট যদি মুক্তমালা পায় তবু তা সে কণ্ঠে ধারণ করে না ! তা হলে সেই মুক্তমালাই তার মৃত্যুর কারণ হয়। আমি কে তুই জানিস ? আমার কাছে এলে তুই দগ্ধ হয়ে যাবি !

ব্যাধ বলল, তুমি যে-ই হও, এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

ব্যাধ দময়ন্তীর দিকে ধেয়ে আসতেই দময়ন্তী একবার চকিতে চক্ষু বুজে মনে মনে বললেন, নল ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে আমি যদি কদাচ চিন্তা না করে থাকি, তাহলে এই দুরাচার আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না কিছুতেই।

তারপর দময়ন্তীও দৌড়ালেন। বন্য পশু শিকার করে যে ব্যাধ আজ সে এক মানবীকে শিকার করার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠল। বনপথ তার পরিচিত। প্রাণীদের পিছু ধাওয়া করা তার প্রতিদিনের কাজ। তবু কামার্ত বলেই যেন আজ তার গতিবেগ তেমন তীব্র নয়। দময়ন্তীকে সে ধরতে পারছে না। অবশ্য সে মনে মনে ভাবল, শেষ পর্যন্ত তো এই নারী ধরা পড়বেই।

এক সময় যখন সে দময়ন্তীর খুব কাছে এসে পড়েছে, তখন বৃক্ষ শাখায় লুক্কায়িত এক কৃষ্ণবর্ণের ব্যাঘ্র লম্ফ দিল ওদের দুজনকেই লক্ষ্য করে। দময়ন্তীর ভাগ্যক্রমে সে ব্যাঘ্র পড়ল ব্যাধের ঘাড়ে। ব্যাধ আর আত্মরক্ষারও সময় পেল না। পশ্চাতে একবারও না তাকিয়ে দময়ন্তী বিধুরার মতন ছুটে যেতেই লাগলেন।

এই ভাবে দময়ন্তীর কেটে গেল তিন দিন। তিনি কখন কোন্ দিকে গেছেন তার কোন জ্ঞান নেই, গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যের মধ্যে তিনি ঘুরেছেন। তাঁর অর্ধ বসন এখন একেবারেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, সারা শরীরে ধূলির আস্তরণ পড়ে গেছে, কেশরাশি জট-পাকানো, চক্ষু দুটি কোটরগত। তাঁকে অতি পরিচিত জনও সহসা চিনতে পারবে না।

ক্লান্ত হয়ে দময়ন্তী এক স্থানে শুয়ে ছিলেন, এমন সময় তিনি একসঙ্গে বহু মানুষের স্বর শুনতে পেলেন। সেই সঙ্গে পশুদের জলক্রীড়ার শব্দও শোনা যাচ্ছে।

কৌতূহলী হয়ে উঠে খানিকদূর যেতেই দময়ন্তী দেখতে পেলেন একটি ছোট নদীর তীরে সমবেত হয়েছে একটি বণিক দল এবং তাদের বাহন অশ্ব ও গজেরা দ্রব্যসম্ভার নদীর অপর পারে নিয়ে যাচ্ছে।

দময়ন্তী পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে যেতেই বণিকদলের কয়েকজন তাঁকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল। কেউ বা ভয়ে ছুটে পালাল কেউ বা ততোধিক ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে হাত জোড় করে নাম জপ করতে লাগল দেবতাদের। সেই কোলাহল শুনে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ছুটে এলো প্রহরীরা।

বনের মধ্যে অকস্মাৎ এমন নারীমূর্তি দেখলে ভয় পাবারই কথা। এই সব অরণ্যে পিশাচ ও রাক্ষসদের অনেক রকম অলৌকিক মায়ার কথা অনেকেই শুনেছে।

দময়ন্তীর চক্ষে জল এসে গেল। মানুষ তাঁকে দেখে ভয় পাবে, এমন কথা তিনি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেননি।

তখন বণিকদলের মধ্যে কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি এই বিকৃত-দর্শনা নারীকে ক্রন্দনরতা দেখে ঈষৎ দয়াপরবশ হলেন। ভয় ত্যাগ করে কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, হে কল্যাণী, আপনি কে, কাহার পরিগ্রহ এবং এই বিজন অরণ্যে কিসের অন্বেষণ করছেন ? আপনার মূর্তি দেখে আমাদের লোকেরা ভয়ে কাতর হয়েছে। আপনি শীঘ্র নিজের পরিচয় প্রদান করুন। আপনি কি মানবী, অথবা বন-পর্বত-নদীর দেবী কিংবা যক্ষী বা রাক্ষসী ?

দময়ন্তী দুই হাত দিয়ে শরীর ঢেকে কোনক্রমে লজ্জা দমন করার চেষ্টা করতে করতে ভাবলেন, এই অবস্থায় তাঁর পিতৃকুল কিংবা শ্বশুরকুলের পরিচয় দিলে উভয় কুলেরই অগৌরব হবে। সুতরাং যথার্থ পরিচয় প্রদান এখানে সঙ্গত নয়।

কম্পিত কণ্ঠে তিনি বললেন, এখানে বালক, যুবা ও স্থবির যতজন আছে, তাদের সকলকে উদ্দেশ্য করেই আমি সত্য বলছি। আমি মানবী, এক সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা এবং সেই রকমই এক বংশের বধূ। ভাগ্য-বিপর্যয়ে এই অরণ্যে এসে পথ হারিয়েছি। আমি স্বয়ং বিপদাপন্ন, আমা-দ্বারা অন্য কারুর বিপদাশঙ্কা নেই।

বণিকদের একজন বললেন, আমি এই সার্থের নেতা, আমার নাম শুচি। আপনি মানবী শুনে আমরা নিশ্চিত হয়েছি, কিন্তু বুঝলাম না এই অরণ্যে আপনি একাকী এসেছেন কেন এবং কেনই বা এমন ধূলিমলিন রূপ ধারণ করেছেন ?

দময়ন্তী বললেন, আমি একা ছিলাম না। আমি স্বামীর সঙ্গে এসেছি এবং কোন অশুভ প্রভাবে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। তোমরা বণিকেরা এই অরণ্য-পথে আসবার সময় কি আমার স্বামীকে দেখেছ ? তাহলে তাঁর সংবাদ জানিয়ে আমার সন্তাপ দূর কর।

দময়ন্তী নলের শারীরিক বর্ণনা দিলেন যথাযথ।

সার্থবাহ নেতা শুচি বললেন, আমরা এই বনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলেছি, কিন্তু অমন কোন মানুষ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। যক্ষরাজ মনিভদ্র আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনিও অনুমতি দিন, আমরা এবার স্বচ্ছন্দে যাত্রা শুরু করি।

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করল, তোমরা কোথায় চলেছ ?

শুচি বললেন, আমরা বাণিজ্যের নিমিত্ত প্রথমে চেদিরাজ সুবাহুর জনপদে যাব।

দময়ন্তী ক্ষণকাল চিন্তা করে বুঝলেন, এই ক'দিনেও যখন নলের সন্ধান পাননি তখন এই অরণ্যে আর তাঁর দর্শন পাবার আশা নেই। একা তিনি বনের মধ্যে থেকেই বা কী করবেন।

সুতরাং তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমায় সঙ্গে নেবে ?

বণিকরা নিজেদের মধ্যে কিছু কিছু মতবিনিময় করে শেষ পর্যন্ত সেই অসহায় নারীকে সঙ্গে নিতে সম্মত হল।

দময়ন্তী চললেন সেই সার্থবাহের সঙ্গে। কেউ কেউ তাঁকে খাদ্য এবং বস্ত্র দান করতে চাইল, কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করলেন না।

সারাদিন ধরে বন পরিক্রমা করার পর সেই সার্থবাহ সন্ধ্যার সময় এক সুরম্য নদীতীরে থামল বিশ্রাম নেবার জন্য। নদীতে ফুটে আছে অসংখ্য পদ্মফুল, দু'পাশের বৃক্ষগুলিও ফল পুষ্প শোভিত। পাখিরা গুঞ্জন-রত, তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের ওপর দিয়ে সুশীতল বাতাস বয়ে যাচ্ছে। স্থানটি রাত্রিবাসের পক্ষে অতি প্রশস্ত। ভারবাহী অশ্ব ও হস্তীগুলিকে সেখানে বাঁধা হল।

অন্যদের থেকে খানিকটা ব্যবধান রেখে এক তরুতলে শয়ন করলেন দময়ন্তী। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রায় তাঁর চক্ষু মুদে এলো।

বণিকদলের মধ্যে কয়েকজন নবীন যুবা দময়ন্তীর দিকে বারবার নিরীক্ষণ করে বুঝতে পেরেছিল যে এই রমণী আসলে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি। ছিন্নভিন্ন বসন ও ধূলি-ধূসরিত দেহ হলেও এর রূপের প্রভা একেবারে চাপা পড়েনি। এই রমণীকে লাভ করার জন্য তাদের বাসনা প্রজ্জ্বলিত হলেও কেউ সাহস করে দময়ন্তীর সমীপবর্তী হল না। তবে আগামীকল্য এই রমণীর মন জয় করার চিন্তা করতে লাগল তারা শুয়ে শুয়ে।

সেই রাত্রে সকলেই নিদ্রিত হয়ে পড়ার পর সেখানে এক ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত হল। আসলে নদীতীরে ঐ স্থানটিতে প্রতিরাত্রে এক পাল বন্যগজ জলপান করতে আসে। যথারীতি মধ্যরাত্রে হস্তিযূথ সেখানে এসে দেখতে পেল বহুসংখ্যক মনুষ্য তাদের গমণপথ জুড়ে শয়ন করে আছে এবং অনেকগুলি গ্রাম্য হস্তী সেখানে বাঁধা আছে। গৃহপোষ্য হস্তীগুলিকে দেখেই সেই বন্য গজের দল ক্রোধান্ধ হয়ে ছুটে এলো আক্রমণ করতে। তারপর শুরু হল এক তাণ্ডব।

ভীত-চকিত গ্রাম্য হস্তীগুলি এই আক্রমণে বাঁধন ছিঁড়ে পলায়ন করবার চেষ্টা করল এবং বন্য গজেরা তাড়া করে গেল তাদের। এতগুলি হস্তীর পদতাড়নায়

লণ্ডভণ্ড হতে লাগল সমস্ত বাণিজ্য-দ্রব্য। বণিকরা আচমকা জেগে উঠে এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে প্রাণ বাঁচাবারও সুযোগ পেল না। কেউ বা করিগণের শুন্ডের বা দন্তের আঘাতে নিহত হল, কেউ বা পদের চাপে বিমর্দিত হল। পশুদের গর্জন ও মানুষের চিৎকার মিলে এক ঘোর শব্দ হতে লাগল সেখানে।

সেই নিদারুণ কোলাহলে দময়ন্তীরও নিদ্রাভঙ্গ হল। খানিক দূরত্ব রেখে শয়ন করেছিলেন বলে গজযুদ্ধের কোন আঘাত তাঁর শরীরে লাগেনি। কিন্তু অদূরে সেই বিভীষণ কাণ্ড হতে দেখে তিনি ভীত ও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

হস্তীর দল এক সময় নদীতে নেমে অন্য পারে চলে গেল। তখন দেখা গেল মূল্যবান দ্রব্য প্রায় সবই বিনষ্ট হয়েছে। বণিকদের মধ্যে অনেকেই নিহত বা নিদারুণ ভাবে আহত। যে-কয়েকজন বণিক পলায়ন করে বা বৃক্ষশাখায় উঠে কোনক্রমে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল তারাও ফিরে এসে হাহাকার করতে লাগল মাটিতে আছড়ে আছড়ে।

সেই শোকের মধ্যেও বণিকদের মনে হতে লাগল কেন এই মহা দুর্দশা ও ঘোর অমঙ্গল। মনিভদ্র কিংবা কুবেরের পূজা দিতে কি কোন বিঘ্ন হয়েছিল?

একজন বণিক শোকের মধ্যেও ক্রোধের বশে চিৎকার করে বলে উঠল, ঐ যে নারীটিকে আমরা সঙ্গে নিয়ে এসেছি, ও দানবী, ওর মায়াতেই এমন হয়েছে।

তখন সকলেই মনে করল, ঐ উন্মত্তদর্শনা, বিকৃতকায়া নারীটি আসলে রাক্ষসী, মানবীর রূপ ধারণ করে বণিক দলের সর্বনাশ করার জন্যই তাদের সঙ্গ নিয়েছে।

বণিকরা তৎক্ষণাৎ ঠিক করল, সকলে মিলে প্রস্তর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঐ রাক্ষসীকে হত্যা করতে হবে।

দময়ন্তী কাতর ভাবে কিছু বলার চেষ্টা করলেও কেউ শুনল না। সম্পদ-হারা, স্বজন-হারা শোকোন্মত্ত বণিকরা লোষ্ট্র, কাষ্ঠ যা পেল হাতের কাছে তাই সজোরে নিক্ষেপ করতে লাগল দময়ন্তীর দিকে। যে কয়েকজন যুবক বণিক দময়ন্তীর ভষ্মাচ্ছাদিত রূপ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল তারাই মারতে এলো হিংস্রভাবে।

একসঙ্গে অনেক দিক থেকে আক্রান্ত হরিণীর মতন দময়ন্তী কোন দিকের কথা চিন্তা না করেই ছুটতে লাগলেন অন্ধের মতন। কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত হলেও কোনক্রমে দময়ন্তী ওদের নাগালের বাইরে যেতে সক্ষম হলেন।

পরদিন নিহতদের সৎকার করে ও আহতদের স্কন্ধে তুলে নিয়ে অবশিষ্ট বণিকদল যাত্রা করল আবার। দময়ন্তী কিন্তু ওদের সঙ্গ ছাড়েননি। তিনি

দূরে অলক্ষ্যে থেকে তাদের অনুসরণ করতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত দময়ন্তী এসে পৌঁছলেন চেদিরাম সুবাহুর রাজধানীতে।

নগর মধ্যে আসার পরও শুরু হল আরেক বিপত্তি! বরবর্ণিনী, পতিব্রতা নলকামিনী দময়ন্তীকে দেখলে এখন প্রকৃতই ভয় করে। শরীরের বসনের বদলে ছিন্ন কন্থা, অতুলনীয় কেশপাশ এখন বল্মীকের স্তূপের মতন, মুখে ও পৃষ্ঠদেশে ছাপ ছাপ রক্ত। নগর বালকেরা তাঁকে দেখে ঘিরে ধরে নিষ্ঠুর কৌতুক করতে লাগল এবং পথের ধূলি ও নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করতে লাগল তাঁর দিকে। দময়ন্তী তবু শান্ত ও নীরব রইলেন।

এই সময় রাজপ্রাসাদের উপরিভাগ থেকে রাজমাতা দেখতে পেলেন বালক-পরিবৃতা দময়ন্তীকে। রমণীটিকে দেখলে উন্মাদিনী মনে হয়। অথচ তার শান্ত ও ধীর ভাব এবং চক্ষু ও মুখের রেখা উচ্চ বংশীর মতন। তাঁকে দেখে আকৃষ্ট হয়ে রাজমাতা এক পরিচারিকাকে পাঠিয়ে ডেকে আনলেন নিজের কাছে।

কাছ থেকে দময়ন্তীকে দেখে আরও বিস্মিত হয়ে রাজমাতা জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রে, তুমি কে? কার পত্নী? এমন দূরবস্থার মধ্যেও তোমার অঙ্গলাবণ্য, মেঘের মধ্যে সৌদামিনীর মতন শোভা পাচ্ছে। তোমার কিছুমাত্র ভয় নেই, আমার কাছে তোমার আত্মপরিচয় খুলে বল।

এতদিন পর স্নেহরসপূর্ণ কোমল বাক্য শুনে দময়ন্তী আর অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না।

রাজমাতা তাঁকে আরও সান্ত্বনা দিলে দময়ন্তী একটু শান্ত হলেন। তারপর পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের নাম গোপন করে সংক্ষেপে তাঁর দুর্বিপাকের কথা শোনালেন রাজমাতাকে। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন এক সৈরিন্ধ্রী হিসেবে। রাজমাতা করুণার্দ্র হয়ে বললেন, ভদ্রে, তুমি আমার কাছেই থাক। আমি তোমাকে আমার কন্যা-সম যত্নে পালন করব। তোমার স্বামীর সন্ধানে আমি অন্যান্য দেশে ব্রাহ্মণদের প্রেরণ করব। অথবা তোমার স্বামীও নানা দেশ পরিভ্রমণ করতে করতে এখানে এসে পড়তে পারেন। সুতরাং বর্তমানে এখানে বসবাস করাই তোমার পক্ষে সবদিক থেকে শ্রেয়।

দময়ন্তী বললেন, হে বীর প্রসবিনী, আপনার কথা শুনে আমি ধন্য হলাম। কিন্তু আমার কয়েকটি নিয়ম আছে। যদি সেগুলি রক্ষা করতে আপনি সম্মত হন, তবেই শুধু আমি আপনার অধীনে থাকতে পারি।

রাজমাতা বললেন, কী তোমার নিয়ম?

দময়ন্তী বললেন, আমি কারও উচ্ছিষ্ট ভোজন করব না এবং পদপ্রক্ষালন

করে দিতে পারব না। আমি কোন পুরুষের সঙ্গে আমার অনিন্দার কথা বলব না। যদি কোন পুরুষ আমাকে প্রার্থনা করে, আপনি তাকে নিবৃত্ত করবেন। কোন পুরুষ যদি সবলে আমাকে গ্রহণ করতে আসে তাহলে আপনি তার প্রাণদণ্ড দেবেন। এইগুলি আমার ব্রত।

রাজমাতা বললেন, তোমার ব্রতগুলির কথা শুনে আমি তোমার ওপরে আরও বেশী সন্তুষ্ট হলাম। ভদ্রে, তোমার এই নিয়মগুলি যাতে প্রতিপালিত হয় আমি সর্বক্ষণ তাই দেখব।

তারপর রাজমাতা তাঁর দুহিতা সুনন্দাকে ডেকে বললেন, দ্যাখ, এই দেবরূপিনী কন্যা এক সৈরিন্ধ্রী। তোমরা দুজনে সমবয়স্ক। তুমি কি একে তোমার সখীত্বে বরণ করে নিতে চাও ?

রাজকন্যা সুনন্দা দময়ন্তীকে দেখে পছন্দ করলেন এবং তাঁর হাত ধরে নিয়ে গেলেন নিজের মহলে।



॥ সাত ॥

এবার নলের কথা।

ঘুমন্ত দময়ন্তীকে ত্যাগ করে নল ছুটতে ছুটতে নিবিড়তর অরণ্যের দিকে চলে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ যাবার পর তিনি দেখতে পেলেন খানিকটা স্থান গোল করে দাবাগ্নি জ্বলছে আর সেখান থেকে কে যেন চিৎকার করছে—বাঁচাও, বাঁচাও রাজা নল, তুমি শীঘ্র এসে আমায় বাঁচাও!

সেই অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে নল হঠাৎ নিজের নাম শুনে অতীব বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কোন একজন লোক বার বার তাঁর নাম ধরেই উদ্ধারের আবেদন জানাচ্ছে বলে তিনি আর দ্বিধা করলেন না, তিনি অগ্নি ভেদ করে মধ্যখানে ঢুকে পড়লেন। তারপর আরও বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, এ কী!

অগ্নিকুণ্ডের মধ্যখানে কোন মনুষ্যই নেই। শুধু কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে একটি সাপ। সেই সাপটিই মানুষের কণ্ঠে বলল, হে পুণ্যশ্লোক রাজা নল, আপনাকে দেখে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। আপনার প্রতীক্ষাতেই আমি ছিলাম। এখন শীঘ্র আমাকে উদ্ধার করুন।

নল প্রশ্ন করলেন, আপনি কে? আমার নামই বা জানলেন কী করে?

সেই নাগ বলল, এখন অত কথা বলার সময় নেই। এখনই অগ্নি এসে আমাদের দুজনকেই বেষ্টন করবে। শুধু এইটুকু জানুন যে এক সময়ে দেবর্ষি নারদের প্রতি বালসুলভ প্রবঞ্চনা করায় তিনি অভিশাপ দিয়ে আমার এই অবস্থা করে গেছেন। আমার চলৎশক্তি নেই। তবে নারদই বলেছিলেন যে রাজা নল হঠাৎ এখানে চলে এলে একমাত্র তিনিই আমাকে উদ্ধার করতে পারেন। সেই জন্যই আপনার নাম ধরে আমি ডাক দিলাম।

নল তখনই সেই সর্পকে স্কন্ধে তুলে নিয়ে প্রাণভয় তুচ্ছ করে আগুনের বৃত্ত পার হয়ে এলেন। তৎক্ষণাৎ সেই কালসর্প দংশন করল তাঁর মাথায়।

অসহ্য যন্ত্রণায় নল সাপটিকে ফেলে দিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তাঁর মনে হল এক্ষুনি তাঁর মৃত্যু হবে। সমস্ত অঙ্গে বিষ ছড়িয়ে যাচ্ছে, তাঁর চক্ষু দুটিও যেন পুড়ে যাচ্ছে আগুনে।

কিন্তু নলের মৃত্যু হল না, খানিক বাদে সেই বিষের ব্যথা আস্তে আস্তে কমল। কিন্তু অদ্ভুত এক পরিবর্তন এলো তাঁর শরীরে। বিষের জ্বালায়



ছটফট করতে করতে তাঁর শরীর যে কুঁকড়ে গিয়েছিল, এখনো সেই অবস্থাতেই রইল। তাঁর দীর্ঘ দেহটি ছোট হয়ে গেল। তাঁর গৌরবর্ণ কান্তি হয়ে গেল কালো, চোখ ও নাকের পরিবর্তন হল, এখন তাঁকে দেখলে তাঁর জননীও চিনতে পারতেন না।

কতখানি যে পরিবর্তন হয়েছে তা নল নিজে তখনি বুঝতে পারলেন না অবশ্য। শুধু গাত্রবর্ণ পরিবর্তনটাই দেখলেন।

তিনি অতি কষ্টে ক্রোধ সংযম করে সেই সাপকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রাণ বাঁচালাম, তবু তুমি আমায় কামড়ালে কেন ?

সাপ বলল, কামড়ানো যে আমাদের স্বভাব।

নল বললেন, আক্রমণকারীকে হত্যা করাও মানুষের স্বভাব। এবার তাহলে আমি তোমায় হত্যা করি ?

সাপ বলল, আমায় হত্যা করে যদি আপনার কোন লাভ হয় তো করুন। বরং চিন্তা করে দেখুন, দংশন করে আপনার আমি উপকারই করেছি। আপনার চেহারা পাল্টে গেছে। এখন আত্মগোপন করে থাকা আপনার পক্ষে অনেক সহজ হবে। এই যে অর্ধেকটা স্ত্রীলোকের বসন পরে আপনি ঘুরছেন, এই অবস্থায় লোকে আপনাকে দেখে চিনতে পারলে আপনার পবিত্র বংশের দুর্নাম হত না।

এই কথা শুনে নল একটু চিন্তা করতেই সাপটি আবার বলল, রাজা, আপনি আমার প্রাণ দান করেছেন, তার প্রতিদান আমি অবশ্যই দেব। সামনেই একটি অশ্বত্থ গাছের কোটরে আমার বস্ত্র লুকানো আছে। আমি উচ্চ নাগবংশীয় সন্তান, আমার নাম কর্কোটক। আমার বস্ত্র আপনার বে-মানান হবে না। সেই বস্ত্র পরিধান করে আপনি সোজা সামনের দিকে চলে যান। কয়েক প্রহরের মধ্যেই আপনি অযোধ্যা নগরীতে পেঁছবেন। আমি জানি আপনি দ্যুতক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন। অযোধ্যার বর্তমান রাজা ঋতুপর্ণ অক্ষ ক্রীড়ায় অতি সুদক্ষ। ঋতুপর্ণ রাজা এখন ভাল রথ চালক খুঁজছেন, আপনি সেই পদের প্রার্থী হোন। তারপর রাজ সন্নিধানে থেকে আপনি অক্ষক্রীড়ার সমস্ত কৌশল শিখে নিতে পারবেন এবং হয়তো আবার একদিন নিজের রাজ্য উদ্ধার করবেন।

নল বললেন, সে না হয় হল। তারপর কি আমি সারাজীবন এই রকম বিকৃত দর্শন হয়েই থাকব ? নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেও আমার প্রজারা চিনতে পারবে কী করে ?

সর্প তখন বলল, দেখুনই না মহারাজ শেষ পর্যন্ত কী হয়। ভবিষ্যতের গর্ভে তো অনেক কিছু অজ্ঞাত বিস্ময় থাকবেই !

কর্কোটকের নির্দেশিত পথে তিন প্রহর হাঁটবার পর নল পৌঁছে গেলেন অযোধ্যায়। অশ্বচালনায় নলের বিশেষ দক্ষতা আছে। সুতরাং রাজা ঋতু-পর্ণের সারথি পদ প্রার্থী হয়ে তাঁকে বিমুখ হতে হল না। ঋতুপর্ণ নলকে

সানন্দে গ্রহণ করলেন। নল আত্মপরিচয় গোপন করে নিজের নাম দিলেন বাহুক।

অযোধ্যার রাজার সারথি হিসেবে নল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। রাজা তাঁকে নিতান্ত সারথি হিসেবে গণ্য করেন না, সখা বা বয়স্যের মতন আন্তরিক ভাবে আলাপচারি করেন। নলের যাতে কোন রূপ অযত্ন না হয় সেজন্য রাজা দুজন পরিচারকও নিযুক্ত করে দিয়েছেন।

এই ভাবে নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কিছুদিন থাকবার পরই নলের মনে দুঃখের অনল প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। দুঃখের চেয়েও বেশী করে দগ্ধ করতে লাগল অনুতাপ। দময়ন্তীর মুখখানি মনে পড়লেই তিনি অবসন্ন হয়ে পড়েন, কোথায় দময়ন্তী? বিশেষ রূপে বহন করার নামই বিবাহ, অথচ তিনি দময়ন্তীর রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ না করে তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন।

বিশেষ কোন অন্যায় করে ফেললে মানুষ নিজের মুখোমুখি হতেও ভয় পায়। নলের অবস্থাও তদ্রূপ হয়ে রইল। নিরালায় থাকলেই তাঁর ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ে এবং চক্ষে জল আসে, সেইজন্য তিনি বারবার ছুটে যান মানুষের কাছে। আবার বেশীক্ষণ অন্যের সাহচর্যও তাঁর ভাল লাগে না।

একদিন নল রাজা ঋতুপর্ণের সঙ্গে রাজসভায় বসে আছেন এমন সময় সেখানে একজন চারণ কবি উপস্থিত হল। সে রাজাকে উদ্দেশ্য করে বলল, হে মহারাজ, আমি গানের ছলে কতগুলি প্রশ্ন শুধব, আপনি বা আপনার সভার যে-কেউ তার উত্তর দিন।

রাজা ঋতুপর্ণ বললেন, আচ্ছা বেশ, শুনে দেখি!

চারণ তখন গান ধরল!

শুনুন, সমবেত সকলে। কোন রাজা যদি জুয়াখেলায় সর্বস্বান্ত হন, তিনি পত্নীকেও ত্যাগ করবেন?

কোন রাজা যদি সর্বস্বান্ত হয়ে পত্নীকে নিয়ে বনবাসী হন, তখন কি তিনি সেই সিংহ-ব্যাঘ্র পরিপূর্ণ অরণ্যে পত্নীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পলায়ন করবেন?

নিয়তির পরিহাসে কোন রাজা যদি পরিধেয় বস্ত্রটাও হারান এবং তাঁর রাণী যদি নিজের বসনের অর্ধাংশ স্বামীকে দেন, তারপরও কি সেই রাজা বসন কেটে অর্ধেক করে ঘুমন্ত পত্নীকে ফেলে পলায়ন করবেন?

কোন রাজা তাঁর সর্বগুণান্বিতা পত্নীকে পরিত্যাগ করার পরও সেই সাধ্বী

রমণী যদি দীনহীনার মতন স্বামীর প্রতীক্ষায় থাকেন, তখনও কি সেই রাজা আত্মগোপন করে থাকবেন ?

গানটি শোনার পর ঋতুপর্ণ বললেন, কাহিনীটি অদ্ভুত তো ! কিন্তু এর কি উত্তর আমি জানি না ।

সভার অন্য কেউও কিছু বললেন না ।

নল এই গান শুনতে শুনতে শিহরিত ও ঘর্মাক্ত হচ্ছিলেন । এই চারণ এই সব কথা জানল কী করে ? জনমানব শূন্য অরণ্যে যা ঘটেছিল, তা তো অন্য কারুর জানার কথা নয় । অথবা এই চারণ কোন কাল্পনিক কাহিনী বলছে, যার সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের ঘটনা মিলে যাচ্ছে ?

নল তখন রাজা ঋতুপর্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ, আমি এর উত্তর দিতে পারি কি ?

ঋতুপর্ণ সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিলেন ।

নল বললেন, হে চারণ, কোন রাজা যদি দ্যূতক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত হবার পর পত্নী ত্যাগের কথা চিন্তা করে থাকেন, তা হলে বুঝতে হবে, সাময়িক ভাবে সেই রাজার মতিভ্রম হয়েছিল । রাজ্যনাশ হলে রাণীর কথাও মনে থাকে না ।

কোন রাজা যদি অরণ্যে পত্নী পরিত্যাগের কথা চিন্তা করে থাকেন, তা হলে বুঝতে হবে, তাঁর পত্নী যাতে আরও বেশী কষ্ট না পান, তিনি সেই কথাই ভেবেছিলেন ।

কোন রাজা যদি পত্নীর সঙ্গে এক বসন ভাগ করে পরেন এবং ঘুমন্ত পত্নীর বস্ত্রাংশ ছিন্ন করে নিঃশব্দে অন্তর্হিত হন, তা হলে বুঝতে হবে তিনি তাঁর পত্নীর সম্মান রক্ষার জন্যই এমন করেছিলেন । দুজনে মিলে এক বসনে অর্ধ-নারীশ্বরের মতন পরিভ্রমণ করতে করতে অন্য কারুর দৃষ্টিগোচর হলে উভয়েই হাস্যাস্পদ হতেন, এক্ষেত্রে পুরুষের চেয়েও নারীর অসম্মান বেশী, সেই জন্যই রাজা তাঁর পত্নীকে এই অপমান থেকে নিষ্কৃতি দিতে চেয়েছিলেন ।

নিয়তির নির্বন্ধে কোন রাণী যদি তাঁর স্বামীর থেকে বিযুক্ত হন, তা হলে স্বামীর প্রতি ভরসা রেখে পুনর্মিলনের জন্য প্রতীক্ষা করাই বিধেয় । জীবিত থাকলে তাঁর স্বামী একদিন না একদিন তাঁকে গ্রহণ করতে আসবেনই ।

এই উত্তর শুনে চারণটি রাজা নলের আপাদমস্তক ভাল ভাবে নিরীক্ষণ করল । এই খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ কুরূপ ব্যক্তিটির মুখে এমন ভাষণ শুনে সে যেন খুবই বিস্মিত হয়েছে ।

সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে ? আপনার পরিচয় কী ?

নল বললেন, আমার নাম বাহুক। আমি রাজার সারথি মাত্র।

রাজা ঋতুপর্ণ বললেন, না হে চারণ, সারথিমাত্র নন্ ইনি। এঁর অনেক গুণ আছে। এঁর মতন এত দ্রুত রথ চালাতে আমি এ পর্যন্ত আর কারুকে দেখিনি। রন্ধন বিদ্যাতেও ইনি শ্রেষ্ঠ, প্রায়ই আমি রাজভোগ ছেড়ে এঁর পাক করা অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করি। ইনি বুদ্ধিমান, মিষ্টভাষী এবং শিক্ষিত। এঁকে এতদিন দেখেই আমি বুঝেছি যে পুরুষ মানুষের শুধু শারীরিক রূপ দেখেই তাঁর চরিত্র সম্পর্কে কোন ধারণা সৃষ্টি করা চলে না।

চারণ আর কিছু না বলে বিদায় গ্রহণ করল।

সে আবার ফিরে এলো পক্ষকাল পরে। এবার তার অঙ্গে উত্তম পোশাক। রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে সে বলল, হে মহারাজ, আমি শুধু চারণ কবি নই, আমি একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত, আমার নাম সুদেব, সম্প্রতি আমি বিদর্ভ দেশের রাজা ভীমের দূত হয়ে আপনার কাছে এসেছি।

ঋতুপর্ণ বললেন, উত্তম! হে দূত, কী বার্তা এনেছ তুমি? রাজা ভীম আমার শ্রদ্ধেয়, তিনি কোন্ অভিপ্রায়ে তোমাকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে?

সুদেব বলল, মহারাজ, অন্যান্য অনেক রাজ্য ঘুরে আসতে পথে আমার দেরি হয়ে গেছে। রাজা ভীমের পক্ষ থেকে অন্যান্য রাজাদের মতন আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করছি। আগামীকল্য ভীমের দুহিতা দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভা হবে। রূপে গুণে দময়ন্তী তুলনাহীনা। সুতরাং আপনিও সেই স্বয়ংবর সভা অলংকৃত করুন, এই আমার অনুরোধ।

ঋতুপর্ণের পার্শ্বে দণ্ডায়মান নল যেন বজ্রাহত হলেন। দময়ন্তীর আবার স্বয়ংবর? দূত যখন ভীমের কন্যার কথা বলছে, তখন তো এই সেই দময়ন্তী! তিনি নিজের কানকে অবিশ্বাস করবেন কী করে? দময়ন্তী এমনই লালসাময়ী যে সে আর অপেক্ষা করতে পারল না। এর মধ্যেই সে দ্বিতীয় স্বামী চায়?

নল একটাও কথা বলতে পারলেন না। মাটির দিকে মাথা হেঁট করে রইলেন। তাঁর বক্ষ যেন বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল।

॥ আট ॥

দ্যূত পণে নলের রাজ্য বিচ্যুতি এবং কন্যা-জামাতার নিরুদ্দেশের সংবাদ অচিরকালের মধ্যেই রাজা ভীমের কর্ণে পৌঁছেছিল। অশেষ গুণান্বিত রাজা নলের এ হেন ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা শুনে রাজা ভীম শোকাভিভূত হলেন। তিনি ভাবলেন যে ওরা দুজনে এসে নিশ্চয়ই তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করবেন।

কিছু দিনের মধ্যেও দুজনের একজনও এলো না দেখে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। দময়ন্তীর জননী তো ইতিমধ্যেই আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করেছেন প্রায়। তখন রাজা ভীম দিকে দিকে দূত প্রেরণ করলেন এবং তাদের বললেন, যে-কেউ নল ও দময়ন্তীকে, বা দুজনের একজনকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, তাকে তিনি এক সহস্র গোধন এবং নগরতুল্য একটি গ্রাম পুরস্কার দেবেন। ফিরিয়ে না আনতে পারলেও শুধু সন্ধান দিলেই সে এক সহস্র ধেনু পাবে।

ব্রাহ্মণরা ছড়িয়ে পড়ল নানা দেশে। কেউ আর কিছুতেই নল বা দময়ন্তীর সন্ধান পায় না।

সুদেব নামে ব্রাহ্মণটি ঘুরতে ঘুরতে উপস্থিত হল চেদিনগরীতে। সেখানে এসে সে কয়েকটি বালকের মুখে শুনতে পেল ছিন্নবেশধারিনী, ধূলিমলিন পাগলিনীর মতন এক নারী কিছু দিন আগে কোথা থেকে এসে রাজ অন্তঃপুরে আশ্রয় নিয়েছে। তখন সেই নারীটিকে দেখবার জন্য কৌতূহল হল সুদেবের।

ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্তঃপুরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য নয়। দৈবজ্ঞ সেজে সুদেব চলে এলো অন্তঃপুরে। ভবিষ্যৎ জানবার জন্য রমণীরা তার কাছে ভীড় করে এলো। তীক্ষ্ন চক্ষে চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করতে করতে সুদেব এক সময় দেখতে পেল দময়ন্তীকে। দময়ন্তীর পরণে এখনো সেই অর্ধেক বসন এবং শরীর ধূলি-মলিন, তিনি মনে মনে শপথ করেছেন নলের দেখা না পাওয়া পর্যন্ত সাজ বদল করবেন না। তবু দময়ন্তীকে দেখা মাত্র চিনতে পারল সুদেব।

অন্যান্য নারীদের দৈব গণনার পর সে দময়ন্তীকে কাছে ডেকে ভবিষ্যং-বিচারের ছলে নিম্নকণ্ঠে বলল, হে বৈদর্ভী, আমি তোমার ভ্রাতার সখা, আমার নাম সুদেব, তোমার সন্ধানে শত শত দূত দিকে দিকে পরিভ্রমণ করছে। ভাগ্যবান আমি তোমাকে পেয়েছি। তোমার সন্তান দুটি ভালো আছে।

সেই কথা শুনে দময়ন্তী রোদন করতে করতে বললেন, হে ব্রাহ্মণ, আপনি



আমার মাতার সংবাদ বলুন। পিতার সংবাদ বলুন। আমার ভ্রাতারা কুশল তো ?

দময়ন্তীকে ক্রন্দন করতে দেখে রাজকন্যা সুনন্দা তাঁর জননীকে ডেকে আনলেন।

রাজমাতা এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে ব্রাহ্মণ, আপনি কে ? এই রমণীটিই বা আপনাকে দেখে কাঁদছে কেন ? মনে হয়, আপনারা দুজনে পূর্ব-পরিচিত।

আপনি কি এই সীমান্তনীর পরিচয় জানেন ? আমি এর সব কথা জানতে বিশেষ অভিলাষ করি।

সুদেব বলল, হে ভদ্রে, আমি বিদর্ভ রাজা ভীমের দূত। এই সুলক্ষণা কন্যা রাজা ভীমের দুহিতা। এঁর দুই ভুরুর মধ্যে পদ্মফুলের মতন একটি জন্ম জড়ুল আছে। এমন সামান্য বেশধারিণী হলেও এঁর সেই জড়ুল দেখেই আমি এঁকে চিনতে পেরেছি।

রাজমাতা ব্যগ্রভাবে বললেন, কই সে জড়ুল দেখি! এতদিন তো লক্ষ্য করিনি!

দময়ন্তীর ললাটে হাত দিয়ে রাজমাতা সেই জড়ুল চিহ্ন দেখে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে বললেন, বৎসে দময়ন্তী, তুমি একথা এতদিন আমায় জানাওনি কেন ? তুমি ভীমরাজার কন্যা শুনলেই আমি চিনতে পারতাম। ওরে, আমি যে তোর সাক্ষাৎ মাসী হই! তোর মা আর আমি দুই সহোদরা, আমরা দুজনেই দশার্ণ দেশের নৃপতি সুদামার তনয়া। তোর জন্ম হয় আমার পিতৃগৃহে দশার্ণ নগরে। সেই সময়ই আমি তোর এই জড়ুল দেখেছিলাম। আমার কাছেও তুই এতদিন আত্মগোপন করে ছিলি ?

দময়ন্তী অশ্রুমোচন করে বললেন, আমার পরিচয় না জেনেও যে আপনি আমার প্রতি কন্যার মতন ব্যবহার করেছেন, এর চেয়ে আর আনন্দের কথা কী আছে!

তখন সুদেব দময়ন্তীর পূর্ণ ইতিহাস এবং নলের নিরুদ্দেশ বৃত্তান্ত রাজমাতাকে শোনাল।

এর দুদিন পর মহা ধুমধাম সহকারে, সৈন্য-সামন্ত এবং নানাবিধ উপহার দ্রব্য সঙ্গে নিয়ে চেদিরাজ ও তাঁর পত্নী আশীর্বাদ করে দময়ন্তীকে বিদর্ভ নগরে পাঠিয়ে দিলেন। দময়ন্তীকে ফিরে পেয়ে বিদর্ভে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। দময়ন্তীর পুত্র-কন্যা দুটি ছুটে এলো মাকে দেখতে।

সেই রাত্রে দময়ন্তী তাঁর জননীকে বললেন, মা, আমি ফিরে এসেছি বটে, কিন্তু যতদিন না আমি আমার স্বামীকে ফিরে পাই ততদিন আমি এই বসন পরিত্যাগ করব না, ভূমিশয্যায় শোব এবং ফলমূল ছাড়া অন্য কিছু ভক্ষণ করব না। মা, তাঁকে ফিরে না পেলে আমি আর বেশী দিন জীবন ধারণ করতে পারব না।

দময়ন্তীর জননী তৎক্ষণাৎ এই কথা জানালেন রাজাকে। রাজা ভীম এসে দময়ন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, পুত্রী, কালই তোমার স্বামীর সন্ধানে আমি এক

সহস্র দূত প্রেরণ করব চতুর্দিকে। তারা সমস্ত অরণ্য ও জনপথ ঘুরে দেখে অবশ্যই নলের সন্ধান আনবে।

দময়ন্তী তাঁর পিতাকে বললেন, তাত, এই সব দূত-ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আমি নিজে কিছু কথা বলতে চাই।

পরদিন সকালে সেই এক সহস্র ব্রাহ্মণ সমবেত হলে দময়ন্তী তাঁদের সামনে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, হে বিপ্রগণ, আমার স্বামী যদি স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করে থাকেন, তবে তাঁর সন্ধান পাওয়া অতি দুষ্কর হবে সুতরাং আপনারা একটি উপায় অবলম্বন করুন। আপনাদের আমি একটি কাহিনী বলছি, আপনারা সেই কাহিনী অনুসারে গান রচনা করে চতুর্দিকে শোনাবেন। সেই সঙ্গীতের মধ্যে কয়েকটি প্রশ্ন থাকবে। যে-ব্যক্তি সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে, আমাকে এসে সেই ব্যক্তির কথা জানাবেন।

সমস্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে একমাত্র ভাগ্যবান সুদেবই ফিরে এসে দময়ন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলল, রাজপুত্রী, অন্য সকলে বিফল হলেও এ পর্যন্ত শুধু আমিই একজনের কাছ থেকে তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর শুনেছি। কিন্তু তাতে জটিলতা আরও বর্ধিত হয়েছে। যে-ব্যক্তি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, তিনি কিছুতেই তোমার স্বামী রাজা নল হতে পারেন না।

দময়ন্তী ব্যাকুল ভাবে বললেন, কেন তিনি আমার স্বামী হতে পারেন না?

তোমার স্বয়ংবর সভায় আমি তো রাজা নলকে দেখেছি। সেই পরম রূপবান পুরুষটির মানস-ছবি আমার চক্ষে লেগে আছে। আমি তাঁকে দেখলে এক নিমেষের মধ্যেই চিনতে পারব। কিন্তু ঐ প্রশ্নগুলির উত্তরদাতার সঙ্গে রাজা নলের বিন্দুমাত্র মিল নেই।

তিনি কি অর্ধেক বসনের কথাও বলেছেন!

হ্যাঁ, তাও বলেছেন।

এ তো কোন ক্রমেই আর কারুর জানবার কথা নয়। তবে তিনি নিশ্চয়ই ছদ্মবেশ ধারণ করে আছেন!

হে কল্যাণী, সে কথাও আমি বিবেচনা করেছি। কিন্তু ছদ্মবেশ ধারণ করে কোন পুরুষ কি দৈর্ঘ্যে খর্ব হয়ে যেতে পারে? কারুর চক্ষু কি ছোট হয়? নাসিকার উচ্চতা হ্রাস পায়? কণ্ঠস্বর পর্যন্ত বিকৃত হয়? এ কখনো হতে পারে না।

আপনি তাঁর সম্পর্কে কী-কী জেনেছেন, আমাকে সম্পূর্ণ বলুন।

তখন সুদেব সবিস্তারে ঋতুপর্ণ রাজার সারথি বাহুকের পূর্ণ পরিচয়

দময়ন্তীকে জ্ঞাপন করলেন।

তারপর দময়ন্তী তাঁর মাতা সুদক্ষিণাকে ডেকে পরামর্শ করতে লাগলেন। দময়ন্তী বললেন, এই সারথি বাহুককে দেখবার জন্য আমার তীব্র বাসনা হচ্ছে। তিনি অশ্ব পরিচালনা এবং রন্ধনকার্যে বিশেষ দক্ষ শুনে আমি আরও বিচলিত হয়েছি।

সুদেব বললেন, সে ব্যক্তির রাজা নল হবার কোন সম্ভাবনাই নয়। আমার মনে হয় সে একজন শঠ।

দময়ন্তী বললেন, তবু আমি তাঁকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই। তাঁকে একবার এখানে আনানো যায় না ?

সুদক্ষিণা বললেন, শুধু একজন সারথিকে ডেকে আনা যাবে কীভাবে ? এ রকম কি কোন প্রথা আছে ?

সুদেব বললেন, তাহলে রাজা ঋতুপর্ণকেও নিমন্ত্রণ করতে হয়।

দময়ন্তী বললেন, যদি একদিনের মধ্যে এত দূরের পথ অতিক্রম করে ঐ সারথি রাজা ঋতুপর্ণকে বিদর্ভে নিয়ে আসতে পারে, তাহলে তার অশ্বচালনার কৃতিত্বেরও একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে।

সুদক্ষিণা বললেন, কিন্তু অন্য এক দেশের নৃপতিকে হঠাৎ এ রাজ্যে আসতে বলা হবে কেন, আর তিনি আসবেনই বা কেন ?

সুদেব বললেন, ঠিক। এমন হয় না।

দময়ন্তী বললেন, মা, একটি মাত্র উপায় আছে। এমন একটি বার্তা পাঠানো যেতে পারে যা শুনে রাজা ঋতুপর্ণ নিশ্চয়ই আসবেন। কিন্তু মা, সে কথা পিতাকে জানানো চলবে না। তিনি জানলে কিছুতেই রাজি হবেন না। পিতার অজ্ঞাতে আমি যদি এই ব্রাহ্মণকে দূত হিসেবে পাঠাতে চাই, তুমি তার দায়িত্ব নেবে ?

সুদক্ষিণা চিন্তা করতে লাগলেন।

সুদেব বললেন, রাজার অমতে রাজদূত হয়ে যাওয়া অতি গর্হিত কাজ। ভীমরাজ জানতে পারলে যদি আমার গর্দান নেন ?

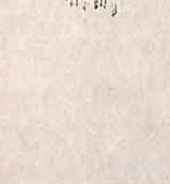
দময়ন্তী বললেন, হে বিপ্র, আপনি অশেষ উপকার করেছেন। এর পর আপনি যদি আমার স্বামীর সন্ধান এনে দিতে পারেন, তাহলে পিতা আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন।

সুদক্ষিণা বললেন, না হয় আমি দায়িত্ব নিলাম। কিন্তু কী এমন বার্তা পাঠানো হবে, যা শুনে রাজা ঋতুপর্ণ তক্ষুনি এ রাজ্যে ছুটে আসবেন ? রাজারা

কি কথায় কথায় অন্য রাজ্যে যান ?

সুদেব বললেন, আমিও তো সে কথাই চিন্তা করছি। সামান্য দূতের মুখের কথা শুনে ঋতুপর্ণের মতন মাননীয় নৃপতি এত দূরে আসবেন কেন ?

দময়ন্তী দৃঢ় স্বরে বললেন, আমার বার্তা শুনে তিনি নিশ্চিত আসবেন। আপনি সে রাজ্যে গিয়ে তাঁকে বলুন, আপনার সঙ্গে দেখা হবার ঠিক একদিন পর আমার স্বয়ংবর হবে। সেই স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত থাকার জন্য রাজা ঋতুপর্ণকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি !



॥ নয় ॥

ঋতুপর্ণ বললেন, হে বাহুক, দূতের মুখে সব তো শুনলে। এবার দেখি তোমার অশ্ব পরিচালনা জ্ঞান। একদিনের মধ্যে তোমার সারথি আমার রথ বিদর্ভ নগরে নিয়ে যেতে পারবে ?

নল তাঁর ক্রোধ, দুঃখ ও বিস্ময়ের অন্তর-সংঘাত অতি কষ্টে দমন করে বললেন, আপনার সারথি যখন স্বীকার করেছি, তখন পারতেই হবে। আপনি বুঝি বিদর্ভ রাজকন্যা লাভ করার জন্য ব্যাগ্র ?

ঋতুপর্ণ হেসে বললেন, সেই সুন্দরী শ্রেষ্ঠাকে লাভ করার জন্য কে না ব্যাগ্র হবে ? তুমি যদি রাজা হতে, তুমিও ছুটে যেতে !

নল বললেন, শুনেছি দময়ন্তীর আর একবার স্বয়ংবর হয়েছিল, তখন যাননি ?

ঋতুপর্ণ বললেন, গিয়েছিলাম, বরমাল্য পাইনি। নল নামে এক অর্বাচীন তাকে জয় করে নিয়ে গেল। শুনেছি নিজের মন্দ বুদ্ধিতে সেই নল রাজ্য হারিয়ে কোথায় নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। নিশ্চয়ই এতদিনে মৃত্যু হয়েছে তার, নইলে আর দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবর হবে কেন ? তবে সত্যি বলতে কী জানো, আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, আর বিবাহে তেমন মতি নেই। তবু যেতে তো হবেই। তুমি বোধ করি আগে কোন রাজার সারথি কর নি ? তা হলে জানতে যে স্বয়ংবর সভায় নিমন্ত্রণ পেলে কোন ঋদ্ধিবান রাজা কখনো প্রত্যাখ্যান করে না।

আর কাল বিলম্ব না করে নল রথ সাজাতে লাগলেন। অনেক বেছে বেছে নল দশটি ক্ষুদ্র কিন্তু তেজী, সুলক্ষণ রোমযুক্ত সিন্ধুদেশীয় অশ্ব সংযোজিত করলেন রথে।

রাজা ঋতুপর্ণ সেই রথে আরোহণ করে বললেন, এ কী হে, আমার অশ্ব-শালায় বৃহদাকার বলশালী অনেক অশ্ব থাকতে তুমি এই গর্দভগুলো নিলে কেন ? তুমি কি ইচ্ছে করে আমার দেরি করিয়ে দিতে চাও নাকি ?

রাজার এই কথায় অপমানিত বোধ করে ঈষৎ উষ্ণ স্বরে নল বললেন, মহারাজ, এক্ষুনি আপনি আমার ক্ষমতা দেখবেন। শক্ত করে ধরে বসুন।

বলতে বলতেই নলের নির্দেশে অশ্বগুলি লম্ফ দিয়ে আকাশ মার্গে উত্থিত

হল এবং যেন উড়ন্ত হয়েই রইল। রাজা এবং তাঁর সঙ্গীরা বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করলেন।

ঝড়ের বেগকেও অতিক্রম করে নল-চালিত রথ নদ-নদী বন-পর্বত জনপদ পার হয়ে যেতে লাগল। নল কোন কথা বলছেন না, গম্ভীর ভাবে শুধু সামনের দিকে চেয়ে আছেন দেখে রাজা ঋতুপর্ণ তাঁর সঙ্গে কৌতুক করার জন্যে বললেন, এই যা, আমার স্বর্ণখচিত উত্তরীয়টি পড়ে গেল! বাহুক, রথ থামাও, এই বার্ষ্ণেয় নেমে গিয়ে উত্তরীয়টি নিয়ে আসুক।

নল বললেন, হে মহারাজ, আপনি এই কথা বলতে বলতেই রথ এক যোজন পথ পার হয়ে গেছে। এখন ফিরে গিয়ে উত্তরীয় আনতে গেলে বিলম্ব ঘটবে।

রাজা বললেন, এ কেমন রথ চালনা, যাতে মূল্যবান বস্ত্র পড়ে গেলেও তোলা যাবে না? তাহলে আর তোমার সিদ্ধি কিসের?

নল বললেন, বেশ, তাহলে দেখুন, এর চেয়েও দ্বিগুণ বেগে রথ চালাতে পারি কি না।

প্রায় মুহূর্তের মধ্যে ফিরে গিয়ে নল সেই উত্তরীয়টি তুলে আনলেন।

নলের কণ্ঠে গর্বের সুর শুনে রাজা বললেন, ওহে বাহুক, এই যে বিভীতক বৃক্ষটি এই মাত্র পার হয়ে গেল সেটিতে দুই সহস্র পঁচানব্বইটি ফল আছে।

নলের মুখে এবার হাস্যরেখা ফুটে উঠল। তিনি শ্লেষের সঙ্গে বললেন, সে কি মহারাজ, ঐ বৃক্ষটি তো আপনি এক পলকের বেশী দেখেননি, তাতেই ওর ফল গণনা করে ফেললেন?

রাজা বললেন, শুধু ফল কেন, ঐ বৃক্ষে কত পত্র আছে তাও আমি বলে দিতে পারি। বিভীতক, যাকে চলতি ভাষায় বয়রা গাছ বলে, তার দুটি শাখাতে পাঁচ কোটি পাতা আছে। আর ঐ বৃক্ষের নিচে একশো একটি করে ফল ও পাতা ঝরে পড়ে আছে। আমি ঠিকই বলছি।

নল রথের রশি সংযত করতে করতে বললেন, মহারাজ, আপনি পরোক্ষ শ্লাঘা করছেন। আমি এখনই ঐ বৃক্ষটি ছেদন করে পত্র ও ফলের সংখ্যা গণনা করব।

রাজা বললেন, আরে না না, তাতে ঢের বিলম্ব হয়ে যাবে। তুমি এক দিনের মধ্যে আমায় বিদর্ভে পৌঁছে দেবে বলেছ, মনে নেই?

নল বললেন, কেউ যদি কোন গুণের অহংকার করে, তবে তার সত্য মিথ্যা যাচাই না করে আমি ছাড়ি না। ঐ বৃক্ষটি আমি কাটবই।

তুমি তা হলে চাও না ঠিক সময়ে আমি বিদর্ভে পৌঁছই?

হয়ে এসেছেন। শুনেছি, এমন দক্ষতা রাজা নল ছাড়া আর কারুর নেই। তা হলে আপনি কী করে এলেন ?

সে দক্ষতা যে আমারও আছে তার প্রমাণ তো সকলেই স্বচক্ষে দেখেছে।

চারণকবির বেশে ব্রাহ্মণ সুদেব ঋতুপর্ণ রাজার সভায় কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন, আর কেউ উত্তর দেয়নি, শুধু আপনি দিয়েছিলেন। নল-বৃত্তান্ত কী করে জানলেন আপনি ?

যে-সব সংকটের কথা চারণকবি বলেছিলেন, তার সমাধানের কথা যে-কোন মানুষের বুদ্ধিতেই সম্ভব। হে ভদ্রে, আমার আর সময় নেই রাজা ঋতুপর্ণের জন্য আমায় রন্ধন করতে হবে, সুতরাং আপনি এবার যান।

ভগ্নমনোরথ হয়ে কেশিনী ফিরে গেল দময়ন্তীর কাছে।

দময়ন্তী আকুল হয়ে বারবার কী হল, কী হল প্রশ্ন করায় কেশিনী বলল, হে যশস্বিনী, ঐ বাহুক কে আমি তা বুঝতে সক্ষম হইনি, কিন্তু আপনার ও নলের প্রসঙ্গ শুনেই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। রথের অশ্ব পরিচালনা এবং চারণের উত্তর দান প্রসঙ্গে তিনি কৌশলে এড়িয়ে গেলেন। তিনি যে নলের অনেক কথা জানেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দময়ন্তীর চিত্ত বিমথিত হতে লাগল। এ কি নিদারুণ সংকট ! ঐ বাহুক নল নন, অথচ নলের অনেক লক্ষণ ওঁর মধ্যে প্রকটিত !

দময়ন্তী বললেন, কেশিনী, তুমি আর একবার ঐ বাহুকের কাছে যাও। তিনি রাজা ঋতুপর্ণের জন্য মাংস পাক করলে তার থেকে একটু চেয়ে নিয়ে এসো। নল-সংস্কৃত হরিণ-মাংস একবার যে আহার করেছে, সে কখনও ভুলতে পারবে না।

কেশিনী এবার গিয়ে উপস্থিত হলেন রন্ধনশালায়। একদা যেখানে নল স্বয়ং মহা সমাদর লাভ করেছিলেন আজ সেখানে তিনি সামান্য এক পাচক। ঘর্মাক্ত কলেবরে তিনি একাকী পাক করছিলেন। কেশিনীর পদশব্দ শুনে তিনি চমকিত হয়ে ফিরে তাকালেন। এবং ভর্ৎসনার সঙ্গে বললেন, ভদ্রে, আপনি আবার এসেছেন ? এই বিজন রাত্রে কোন রমণীর সঙ্গে কথা বললে, লোকে আমার অপবাদ দেবে। কোন্ উদ্দেশ্যে আপনি এ রকম যাতায়াত করছেন ?

কেশিনী কুণ্ঠিত ভাবে বলল, মহোদয়, লোকমুখে আপনার পাক-কার্যের সবিশেষ প্রশংসা শুনেই আমি এসেছি। আপনার রন্ধন করা সামান্য একটু মাংস আপনি আমাকে প্রদান করবেন কি ?

নল বললেন, কোন প্রার্থীকে আমি বিমুখ করি না। সুতরাং আপনার

যতখানি খুশি নিয়ে যান।

অঞ্চলের আড়ালে লুক্কায়িত পাত্র বার করে কেশিনী তাতে কিছুটা মাংস ঢেলে নিয়ে চলে গেল।

সেই মাংস মুখে দেওয়া মাত্র দময়ন্তী বললেন, আর কোন সন্দেহ নেই, এমন মাংস তিনি ছাড়া আর কেউ পাক করতে পারেন না। কেশিনী, এখন আমি কী করি ?

কেশিনীও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শেষ পর্যন্ত ডেকে আনল রাণী সুদক্ষিণাকে। দময়ন্তী তাঁকে বললেন, মা, ঐ বাহুককে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছি যে উনিই নল। শুধু তাঁর রূপ-বিষয়ে সংশয় আছে। হয়তো এমন ছদ্মবেশ ধরা সম্ভব যা অন্যের চক্ষে কিছুতেই ধরা পড়ে না। সুতরাং আমি নিজে তাঁকে একবার নিভৃতে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। এখন পিতার জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক তুমি তাঁকে একবার আমার কাছে এনে দাও।

সুদক্ষিণা আর বেশী ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। তিনি রাজা ভীমকে এবার সব কথা অবগত করালেন। উদারহৃদয় এবং যুক্তিমান রাজা ভীম সব দিক বিবেচনা করে অনুমতি দিলেন তাঁর কন্যাকে।

গভীর রাত্রে চারজন প্রহরী গিয়ে নলকে বলল, রাজা ভীম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। রাজাদেশ কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না বলে নল চলে এলেন তাদের সঙ্গে। প্রহরীরা একটি কক্ষের মধ্যে নলকে প্রবেশ করতে বলে বিদায় নিল।

দ্বার খুলে নল দেখলেন, মাটিতে ব্যাঘ্রচর্ম পেতে তার উপরে যোগিনীর মত বসে আছেন দময়ন্তী।

প্রায় তিন বৎসর পর দময়ন্তীকে চক্ষের সামনে দেখেও নলের হৃদয় কম্পিত হল না, তিনি ছুটে গিয়ে দময়ন্তীকে আলিঙ্গন করলেন না, দময়ন্তীর কোন কুশল-সংবাদও নিলেন না। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, আমি ভেবেছিলাম, মহারাজ ভীম আমাকে আহ্বান করেছেন। এত রাত্রে রাজনন্দিনীর যে পর-পুরুষদের নিভৃত কক্ষে ডেকে এনে কথা বলার অভ্যেস আছে, তা আমার জানা ছিল না !

দময়ন্তী বিস্মিত, আয়ত নেত্রে দেখলেন বাহুককে। সেই দীর্ঘকায়, গৌর-বর্ণ, বৃষস্কন্ধ, সুঠাম, কন্দর্পকান্তি রাজা নলের পরিবর্তে এ যে এক খর্বদেহ, কৃষ্ণবর্ণ, হ্রস্ববাহু, কুরূপ ব্যক্তি ! এমন ছদ্মবেশ কি হতে পারে ?

পরস্পর-বিরোধী আবেগে বশীভূত হয়েও দময়ন্তী অতি কষ্টে প্রশ্ন করলেন,

ওদিকে প্রাসাদ শিখরে অচেতন-প্রায় দময়ন্তীকে দেখতে পেয়ে পরিচারিকারা তাঁর শয়ন কক্ষে নিয়ে এলো। সেখানে দময়ন্তী নিদারুণ হুতাশ করতে লাগলেন। তিনি বার বার বলতে লাগলেন, আমি ভেবেছিলাম, আজই আমার স্বামী-সন্দর্শন হবে। হায়, আমার সব আশা বিনষ্ট হল!

খানিক পরে কিছুটা সামলে নিয়ে তিনি তাঁর এক অন্তরঙ্গ পরিচারিকাকে বললেন, কেশিনী, ঐ হ্রস্ববাহু, বিকৃত কলেবর সারথির কথা আমি মন থেকে তাড়াতে পারছি না কিছুতেই। উনি কেন বা কী ভাবে সুদেব ব্রাহ্মণের প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছিলেন? তুমি একবার ওঁর কাছে যাও এবং তোমার বুদ্ধি মতন নানা ভাবে ওঁকে পরীক্ষা করে এসো।

কেশিনী রথশালায় গিয়ে ঋতুপর্ণের রথের পাশে দাঁড়িয়ে নলকে উদ্দেশ্য করে মৃদু কণ্ঠে বললেন, মহাশয়, আপনি কি নিদ্রিত?

নল চক্ষু উন্মিলিত করে বললেন, কে?

কেশিনী বলল, আমি রাজপুত্রী দময়ন্তীর অন্তরঙ্গ সহচরী, আমার নাম কেশিনী, আমি আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে এসেছি। আপনি কে?

নল গম্ভীর স্বরে বললেন, আমি সামান্য একজন সারথি, আমার নাম বাহুক। রাজকুমারীর সহচরীর সঙ্গে পরিচয় করবার যোগ্যতা আমার নেই। তাছাড়া এই সন্ধ্যাকালে কোন রমণীর সঙ্গে নিভৃত সাক্ষাৎকার আমি সঙ্গতও মনে করি না!

কেশিনী বলল, রাজপুত্রী দময়ন্তী আমায় পাঠিয়েছেন, আপনি কি রাজা নলের কোন সংবাদ জানেন?

নল উত্তপ্ত হয়ে উত্তর দিলেন, কোন্ নল? সেই ভাগ্যহীন রাজা, যে নিজের দোষে সব কিছু হারিয়েছে? নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়েছে তাঁর, নইলে দময়ন্তী আবার দ্বিতীয় স্বয়ংবর ডাকবেন কেন? এখন তাঁর সংবাদে দময়ন্তীর আর প্রয়োজন কী?

বাহুক, আপনি ভুল করছেন। স্বামীপ্রাণা দময়ন্তী এখনও অর্ধবস্ত্র পরিধান করে কঠোর জীবন যাপন করেন এবং সর্বদা নলের কথা স্মরণ করে রোদন করেন।

সেই জন্যই বুঝি তিনি আবার স্বয়ংবর আহ্বান করেছেন! রাজ্যভ্রষ্ট, স্ত্রীহীন, ক্ষুধার্ত, অসহায় নলের কথা মন থেকে বিদূরিত করে তিনি অন্য স্বামী চান!

রাজা নলকে আকৃষ্ট করার জন্যই তো এই স্বয়ংবরের ছল।

দময়ন্তী বুঝি ভেবেছেন দ্বিতীয় স্বয়ংবরের কথা শুনেই নিরুদ্দিষ্ট নল ছুটে



আসবেন ? অন্যান্য লোভী রাজাদের সঙ্গে বসে তিনি নিজের ধর্মপত্নীকেই পদ্নরায় লাভ করার জন্য যত্নবান হবেন। নল যদি সত্যিই এমন কাজ করেন, তবে ধিক্ তাঁকে !

আপনি কেন রাগ করছেন আমি জানি না। আপনি আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দেবেন ? শত শত যোজন পথ আপনি রথে মাত্র এক দিবসের মধ্যে পার

হে মহাভাগ,      করে বলুন, আপনি কে ?

নল বললেন, আমি সারথি বাহুক, ভীমরাজ-তনয়ার আমাকে কী প্রয়োজন হল, তা বুঝতে পারছি না।

দময়ন্তী বললেন, না, আমার অন্তরাত্মা বলছে, আপনিই আমার প্রাণপতি রাজা নল। আপনি আমার সঙ্গে ছলনা করছেন !

ভদ্রে, আপনি যে নলকে চিনতেন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। যদি বা তাঁর মৃত্যু এখনো না হয়েও থাকে, তবু তিনি যখন শুনবেন যে দময়ন্তী ধৈর্যহীনা, অধীরা হয়ে আবার স্বয়ংবর সভা ডেকে স্বৈরিণীর মতন দ্বিতীয় ভর্তা বরণ করতে চান, তা হলে তিনি যে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা পাবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আপনি আমাকে এই কথা বলছেন ? আপনি আর কোন ধর্মজ্ঞ পুরুষের কথা জানেন, যিনি অরণ্যে নিদ্রিতা পত্নীকে অশেষ বিপদের মধ্যে ফেলে একাকী পলায়ন করেন ? আমি তাঁর কাছে কোন অপরাধ করেছিলাম কি, যে জন্য তিনি বিনা দোষে আমায় পরিত্যাগ করলেন ? দেবগণের সমক্ষে অগ্নিসাক্ষী করে তিনি বলেছিলেন "আমি সারা জীবন তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করব" তাঁর সেই শপথ কোথায় গেল ?

সেইজন্যই বুঝি তাঁর প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্য অস্থির হয়ে আপনি দ্বিতীয় স্বয়ংবর সভার আহ্বান করেছেন ? স্বেচ্ছাচারিণীর মতন আপনি দ্বিতীয় পুরুষের অঙ্কশায়িনী হবার জন্য ব্যাকুল !

ধর্ম জানেন, ঈশ্বর জানেন, আমি দ্বিতীয় কোন পুরুষকে মনে স্থান দিইনি !

তবু বিশ্বশুদ্ধ লোক জেনে গেল যে ভীম-কন্যা দময়ন্তী দ্বিতীয় স্বয়ংবর চান। ঋতুপর্ণের মতন লালায়িত রাজারা সেই রমণীরত্নকে লাভ করার জন্য ছুটে এসেছেন। তাঁদের কামনার নিশ্বাস ধাবিত হয়েছে আপনার দিকে।

দময়ন্তী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনার কঠোর বাক্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হতে পারত। কিন্তু আমি বুঝে গেছি আপনিই রাজা নল। নাথ, আমি যথেষ্ট দুঃখ পেয়েছি, আর দুঃখ আমার সইবে না, এবার আপনি আমায় বক্ষে স্থান দিন।

আমি আপনার নাথ হব কী করে ? আপনি আমার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখুন। ছিঃ ভদ্রে, একজন সামান্য সারথির বক্ষে আপনি স্থান চাইছেন, আপনার দুর্নাম রটবে যে !

কিন্তু রাজা নলের সমস্ত গুণ আপনাতে উপস্থিত।

যদি ধরেই নিই নলের সমস্ত গুণ আমার আছে, তবু কি আপনি আমায় বরণ

করে নিতে পারবেন ? এই কুরূপ, কদাকার পুরুষকে অন্য কে নল বলে বিশ্বাস করবে ! সকলেই মনে করবে, আপনি এক সারথির সঙ্গে ব্যাভিচারিণী হয়েছেন। অমন ভুল করা আপনার উচিত হবে না। নলের কথা আপনি ভুলে যান, আপনি স্বয়ংবর সভা ডেকেছেন, কাল প্রাতে যশস্বী, সুরূপ কোন রাজাকে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে বরণ করুন ! বলে দময়ন্তীর উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করে নল সে কক্ষ থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন এবং ফিরে চললেন অতিথিশালার দিকে।

অতিথিশালার এক প্রান্তে একটি কুটুরী সারথির জন্য নির্দিষ্ট। সেখানে প্রবেশ করে দ্বার বন্ধ করে দিলেন নল। তারপর দু'হাতে বক্ষ চেপে চক্ষু বুজে দাঁড়িয়ে রইলেন।

একটু পরে বেশ জোরে ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে তিনি চক্ষু খুলতেই দেখলেন এক বিশাল সর্প রয়েছে সেই ঘরের মধ্যে। চমকিত ও ভীত হয়ে নল পিছিয়ে যাবার উপক্রম করতেই সেই নাগ বলে উঠল, মহারাজ, ভয় পাবেন না। আমায় চিনতে পারছেন না ? আমি সেই কর্কোটক। বেশ একটা চরম মুহূর্তে আমি উপস্থিত হয়েছি আপনাকে একটি সংবাদ জানাতে।

নল জিজ্ঞেস করলেন, কী সংবাদ ?

কর্কোটক বলল, আপনাকে আমি দংশন করেছিলাম, মনে আছে নিশ্চয়ই ? যেহেতু আপনাকে হত্যা করার বাসনা আমার ছিল না, তাই পূর্ণ বিষ ঢালিনি। অর্ধেক বিষের প্রভাবে আপনার রূপ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, সেই বিষের প্রভাব অন্তর্হিত হবার সময় এসেছে। অচিরেই আপনি পূর্ব রূপ ফিরে পাবেন।

নল চিৎকার করে বললেন, না না, আমি আর সেই রূপ ফিরে চাই না। আমি এই অবস্থাতেই বেশ আছি। আমি বাহুক হয়েই থাকতে চাই।

কর্কোটক বলল, তা বললে কী হয় মহারাজ ! এই সময় আপনার রূপ ফিরে এলেই তো খেলা জমবে।

নল বললেন, হে কর্কোটক, আমি এ রাজ্য থেকে আগে চলে যাই, তারপর না হয় আমার রূপ ফিরে আসুক। এখানে আমার পরিচয় কেউ জানুক, আমি চাই না।

কর্কোটক বলল, মহারাজ, ভবিতব্য কে খণ্ডাতে পারে ? এবার দ্বার খুলে দিন, আমি বিদায় হই।

পরদিন অতি প্রত্যুষে নল তাঁর কুঠুরির দ্বারে করাঘাত শুনতে পেলেন। ঘুম জড়িত চক্ষে দ্বার খুলে দিতেই দেখলেন এক বালক ও বালিকা সেখানে দণ্ডায়মান।

নিজের পুত্র-কন্যাকে দেখা মাত্র নল সব কিছু বিস্মৃত হয়ে তাদের বক্ষে তুলে নিয়ে স্নেহচুম্বন দিতে লাগলেন, তারাও—পিতা, পিতা বলে ডেকে উঠল।

রাত্রের মধ্যেই যে তাঁর শরীর পরিবর্তিত হয়ে পূর্ব রূপ ফিরে এসেছে সে কথা নল তখনও জানেন না। পুত্র-কন্যা তাঁকে কী ভাবে চিনল এই কথা চিন্তা করতে করতেই তিনি দেখলেন অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন দময়ন্তী।

পুত্র-কন্যাকে বক্ষ থেকে নামিয়ে দিয়ে নল বললেন, ভদ্রে, যে কোন বালক-বালিকাদের দেখলে আমার মনে এমনই স্নেহ জাগে। তাই আমি ওদের আদর করছিলাম। আমি ওদের কেউ নই।

দময়ন্তীর আজ অন্য সাজ। সেই অর্ধ বসন পরিত্যাগ করে আজ তিনি নববধূর মতন উত্তম বসনে বিভূষিতা হয়েছেন। শরীর ভরা অলঙ্কার। হাতে একটি সুগন্ধ পুষ্পমাল্য।

স্মিত হাস্য দময়ন্তী বললেন, মহারাজ, আপনি বারবার স্বয়ংবর সভার কথা বলছিলেন। আজ উষালগ্নে আমার স্বয়ংবর, আমি আপনাকে বরণ করতে এসেছি। আপনি আমাকে ধন্য করুন।

নল বললেন, হে রূপসী, আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন। রাজা ঋতুপর্ণ অতিথিশালায় শ্রেষ্ঠ কক্ষে শুয়ে আছেন। আপনার পরিচারিকারা আপনাকে পথ দেখিয়ে সেদিকে নিয়ে যেতে পারবে।

এবার দময়ন্তীর চক্ষু জ্বলে উঠল। তিনি তেজের সঙ্গে বলে উঠলেন, আর্যপুত্র, আপনি এখনো আমাকে এ রকম হীন কথা বলতে পারলেন ? আমি দেবতাদেরও উপেক্ষা করে আপনাকে গ্রহণ করেছি, সে কথা আপনার স্মরণে নেই ? আপনার যে রূপ পরিবর্তিত হয়েছে সে কথা না জেনেই আমি আজ আপনার কাছে এসেছি। পুত্র-কন্যা সঙ্গে নিয়ে কোন নারী স্বয়ংবর সভায় যায় ? তবু আপনি আমার প্রতি এরূপ অনুচিত সন্দেহ প্রকাশ করলেন বলে আমি এই দণ্ডেই, এই স্থলেই প্রাণত্যাগ করব।

হাতের মালা খসে পড়ল, দময়ন্তীর শরীর বেতসপত্রের মতন কম্পিত হতে লাগল, সংজ্ঞাহীনা হয়ে তিনি ভূমিতে পড়ে যাবার আগেই নল দু'বাহু বাড়িয়ে তাঁকে ধরে ফেললেন। অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, দময়ন্তী, তুমি আমার, তুমি শুধুই আমার। অর্ধশুষ্ক শষ্য-সমন্বিত ভূমিতে অকস্মাৎ প্রবল বর্ষণ হলে বসুন্ধরা যে-রকম আপ্যায়িত হন, নলের বাক্য শুনে সেই রকম আনন্দে আপ্লুতা দময়ন্তী পতির বক্ষলগ্না হয়ে আবেশে চক্ষু মুদলেন।

## ॥ দশ ॥

ঠিক বিবাহ উৎসবের মতনই নল দময়ন্তীর পুনর্মিলন উপলক্ষে বিরাট উৎসব হল বিদর্ভ রাজ্যে। রাজা ভীম ও রাণী সুদক্ষিণা কন্যা-জামাতাকে পেয়ে আনন্দসাগরে ভাসলেন। প্রজাগণ হর্ষোৎফুল্ল মুখে দলে দলে ভিড় করে দেখতে এলো এই ভাগ্যবান দম্পতিকে।

রাজা ঋতুপর্ণ এই বিচিত্র বার্তা শ্রবণ করে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন প্রথমে। তাঁর সারথি বাহুকই রাজা নল? তিনি এলেন দময়ন্তীর স্বয়ংবরে আর তাঁর সারথি জয় করে নিল সেই রমণীশ্রেষ্ঠাকে!

নলের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করে তিনি বললেন, হে মহারাজ, আপনি যে ছদ্মবেশে আমার আলয়ে অজ্ঞাতবাস করেছিলেন, এমন আমি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিনি। আপনি আমার সারথি থাকাকালীন আমি যদি কোন অন্যায় ব্যবহার করে থাকি, সে জন্য আপনি আমায় ক্ষমা করবেন।

নল বললেন, আপনি সর্বদা আমার সঙ্গে সুহৃদের মত ব্যবহার করেছেন সে জন্য আমি ধন্য।

ঋতুপর্ণ বললেন, ভাগ্যিস আমি আপনাকে আগেই জানিয়েছিলাম যে দময়ন্তীকে লাভ করার তেমন কোন বাসনা আমার নেই। আমি স্বয়ংবরের নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছিলাম নিতান্ত নিয়ম রক্ষার্থে, এ কথা আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে। আর এও বিশ্বাস করুন যে আপনাদের দুর্ভাগ্যের অবসান হওয়ায় এবং পুনর্মিলনে আমি প্রকৃতই খুশি হয়েছি।

নল বললেন, এ আপনারই যোগ্য কথা। কিন্তু মহারাজ, আপনি যে আমায় সংখ্যা নিরূপণ বিদ্যা শিক্ষা দেবেন বলেছিলেন, সে কথা কিন্তু ভুলিনি।

ঋতুপর্ণ বললেন, বেশ আমি আপনাকে সংখ্যান-বিদ্যা এবং অক্ষ-পরীক্ষা দেব, তার বদলে আপনি আমায় অশ্বচালনা বিদ্যা দিন।

তখন দুজনে পরস্পরের জ্ঞান বিনিময় করলেন। এবং রাজা ঋতুপর্ণ হৃষ্টমনে বিদায় নিয়ে নিজ রাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা করলেন পরদিন।

বিদর্ভ রাজ্যে কিন্তু ভোগ সম্ভোগের মধ্যে থেকেও নলের মন অস্থির হয়ে রইল। রাজ্যহীন হয়ে রাজ-জামাতা সেজে থাকার মধ্যে কোন সম্মান নেই। পূর্বের রূপ ফিরে পাবার পর থেকেই নলের শরীরে-মনে যেন নতুন শক্তি

এসেছে, তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে বহুগুণ হয়ে।

কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি যাত্রা করলেন নিজ রাজ্যের দিকে। দময়ন্তী ও পুত্র-কন্যাদের তিনি রেখে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু দময়ন্তী সে প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হলেন না। নল তখন রাজা ভীমের কাছ থেকে একটি অশ্ব, ষোলটি হস্তী, পঞ্চাশটি অশ্ব, ছয়শত পদাতিক এবং সেই অনুপাতে স্বর্ণমুদ্রা ঋণ নিয়ে প্রবল উৎসাহে মেদিনী কম্পিত করে ফিরে চললেন নিষধ রাজ্যে।

রাজ্যের সীমানা প্রান্তে এসে নল কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সঙ্গে সেখানেই দময়ন্তীকে অপেক্ষা করতে বলে নিজে চললেন রাজধানীতে। হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করে তিনি দময়ন্তীকে নিয়ে যাবেন।

রাজা পুষ্করনি শ্চিন্ত মনে রাজ্য-সুখ ভোগ করছিলেন, হঠাৎ তাঁর সভায় কালান্তকের মতন এসে উপস্থিত হলেন রাজা নল। তিনি হুংকার দিয়ে বললেন, নৈষধ, আমি পুনর্বার দ্যূতক্রীড়ার জন্য এসেছি। আমার সঙ্গে প্রচুর ধন সম্পদ আছে। তুমি প্রস্তুত হও।

পুষ্কর বললেন, আপনি আহ্বান করলেই যে আমি আবার দ্যূতক্রীড়ায় বসব, তার কি কোন অর্থ আছে? আমি যদি সম্মত না হই?

নল তখন সভাস্থ বিশিষ্ট নাগরিকদের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাঁদের সাক্ষী রেখে বললেন, পুষ্কর, তাহলে তোমার আর একটি পথই খোলা রয়েছে। রাজাদের ধর্ম এই যে নষ্ট রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁরা আপ্রাণ যত্নবান হবেন। অন্যের ধন-সম্পত্তি ও রাজ্য জয় করলেও প্রতিপণ দিতে হয়। এখন হয় তুমি আমার সঙ্গে রাজ্য বাজি রেখে দ্যূতক্রীড়া, অথবা আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হও। অন্য কারো সহায়তা না নিয়ে তুমি ও আমি রথারোহণ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব। এতে তোমারও প্রাণ যেতে পারে। জীবিত থেকে যে জয়ী হবে, সে-ই রাজা হবে।

সভাসদবৃন্দ বললেন, রাজধর্ম অনুসারে এই দুটির একটি পথ বেছে নেওয়াই রাজা পুষ্করের কর্তব্য।

পুষ্কর দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাজি নন, কারণ নলের ক্ষমতা তিনি জানেন। তিনি বললেন, দ্যূতক্রীড়ায় আমার অনাগ্রহ নেই, কিন্তু আমার রাজ্যের বিনিময়ে আপনি কী বাজি ধরবেন? আপনি ধন-রত্ন এনেছেন, সে সব আমার যথেষ্ট আছে, সে সবের জন্য আমি আর দ্যূতক্রীড়া করতে চাই না। একটি মাত্র শর্তে আমি আপনার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রাজি আছি।

কী সেই শর্ত ?

তিন বৎসর আগে যেখানে খেলা শেষ হয়েছিল, আবার খেলা শুরু হবে ঠিক সেখান থেকে।

নল এ কথার অর্থ ঠিক ধরতে পারলেন না। যেখানে খেলা শেষ হয়েছিল ঠিক তারপর থেকে শুরু হবে কী ভাবে ?

নলের জিজ্ঞাসু নেত্র দেখে রাজা পুষ্কর আবার বললেন, শেষ খেলায় আপনি রাজ্য হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। তবু আপনার একটি সম্পদ বাকি ছিল। এবার সেই সম্পদ বাজি ধরুন।

কী সেই সম্পদ ? আমার প্রাণ ? হ্যাঁ, রাজি আছি।

না, আপনার প্রাণ নয়। দময়ন্তী !

কী বললি তুই ?

নলের গর্জন শুনেও ভীত না হয়ে দুর্বিনীত রাজা পুষ্কর বললেন, ওহে পরাজিত জুয়াড়ী, যদি দময়ন্তীকে বাজি রেখে দ্যূতক্রীড়া করতে চাও তো বল, আমি প্রস্তুত ! নইলে তোমার যেখানে ইচ্ছা যাও, আমার সময় অপব্যয় কোরো না ! নতুন ভাবে দ্যূতক্রীড়া শুরু হলে আমারই বাজি ঠিক করার অধিকার আছে, সে কথা সভাসদরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

সভাসদগণ কেউ এ কথার সমর্থনও করলেন না, প্রতিবাদও করলেন না, নিঃশব্দে বসে রইলেন।

নল মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে বললেন, তবে তাই হোক। এক দিকে দময়ন্তী, অন্য দিকে রাজ্য ! কিন্তু দময়ন্তীকে ক্রীড়াকক্ষে আনবার প্রয়োজন নেই, আমার মুখের কথাই যথেষ্ট।

তা শুনে রাজা পুষ্কর নিজ উরুতে চাপড় মেরে উল্লাসের সঙ্গে বললেন, আর দময়ন্তীকে আনয়নে বিলম্ব করেই বা কী লাভ ! এখুনি তো আমি তাঁকে জিতে নেব ! আমি বহু দিন থেকে সেই অসামান্যা রূপবতীকে মনে মনে কামনা করেছি। অপ্সরাগণ যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের সেবা করে, সেই রকম আজ থেকে জয়লব্ধা দময়ন্তী আমার পরিচর্যা করবেন !

রাজা পুষ্করের এ রকম দুঃশীল বাক্য শুনে নল আর থাকতে পারলেন না। তখুনি খড়গ তুলে পুষ্করের শিরশ্ছেদ করার জন্য ধেয়ে গেলেন।

পুষ্কর সভাসদদের দিকে চেয়ে বললেন, আপনারাই দেখুন, এই ব্যক্তি খড়গ তুলে দ্যূতক্রীড়া করতে চায় ! এই তো এর রাজধর্ম জ্ঞান !

কয়েকজন সভাসদ উঠে দাঁড়িয়ে নলের উদ্দেশ্যে বললেন, হে মহাভাগ, অযথা

কলহে কোন কিছুরই নিষ্পত্তি হবে না। আপনারা দুজনে বরং দ্যূতক্রীড়া শুরু করুন।

তখন ক্রীড়ার জন্য আসন সজ্জিত হল। পুষ্কর মনে মনে কলি দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করলেন, কিন্তু কলি আর এলেন না। নিরপরাধ নল ও দময়ন্তীকে কষ্ট দেওয়ায় কলি অন্য দেবতাদের কাছে ভর্ৎসিত হয়ে আছেন, পুষ্করের ডাক তিনি অগ্রাহ্য করলেন।

পুষ্কর নিজের অক্ষ সামনে রাখতেই নল ঋতুপর্ণের কাছ থেকে আয়ত্ত করা বিদ্যার গুণে বুঝতে পারলেন যে ঐ অক্ষগুলির মধ্যে কূট কৌশল করা আছে। সেগুলি তিনি মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়ে নিজের অক্ষ বার করে সমস্ত সভাসদদের পরীক্ষা করতে দিলেন।

সকলে সেগুলি দেখে দোষশূন্য বলে স্বীকার করতেই নল তাঁর অক্ষের দান দিয়ে বললেন, এই জিতলাম!

সত্যই তাঁর জয় হল। সভাসদগণ তাঁর জয় ঘোষণা করলেন, পুষ্করের মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করল।

জয়ী হবার পরও ক্রোধোন্মত্ত নল লম্ফ দিয়ে এগিয়ে এসে পুষ্করের কণ্ঠ চেপে ধরে বলে উঠলেন, ওরে দুরাচার, তুই অলোকসামান্যা দময়ন্তী সম্পর্কে কু-কথা বলেছিস, আমি কালই তোর প্রাণদণ্ড দেব।

নলকে সভাসদগণ রাজসিংহাসনে বসালেন। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎ গতিতে। ধৃতিমান, দানশীল, পুণ্যাত্মা নলকে আবার রাজা রূপে ফিরে পেয়ে প্রজারা জয়ধ্বনি করতে লাগল সারা রাজ্য জুড়ে।

ভিখারিনীর মতন চলে গিয়েছিলেন দময়ন্তী আবার নিষধদেশের মহামান্যা রাজরাণী হয়ে তিনি এ রাজ্যে প্রবেশ করলেন।

আনন্দের রাত্রিটি পার হবার পর পরদিন সকালে রাজা নল যখন পুষ্করের জনসমক্ষে মৃত্যুদণ্ড দেবার ব্যবস্থা করছেন, তখন দময়ন্তী তাঁকে বিরলে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

রাজা নল বললেন, হে কল্যাণী, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। একটি কেন, তুমি শত প্রার্থনা করতে পারো। সবই তো তোমার।

দময়ন্তী বললেন, আমার মোটে একটিই প্রার্থনা আছে। কথা দিন, আমায় বিমুখ করবেন না?

বল!

আপনি পুষ্করকে মুক্তি দিন!



রাজা নল প্রস্তরমূর্তির মত স্থির হয়ে গেলেন। তাঁর দৃষ্টি দময়ন্তীর মুখে আবদ্ধ হল। একটুক্ষণ এ ভাবে থাকার পর তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ও, তোমার মনে তাহলে এই ছিল? এই জন্যই তুমি এখানে ফিরে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে? পুষ্করের জন্য তুমি উৎকণ্ঠিতা ছিলে এত দিন। পুষ্করও বলেছে, মনে মনে সে এতকাল ধরে তোমাকে চেয়েছে। তোমরা পরস্পরের কামী! বেশ, পুষ্করকে মুক্তি দিয়ে, তাকে এই রাজ্যও

ফিরিয়ে দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। তোমরা এখানে সুখে থাকো।

দময়ন্তী এগিয়ে এসে নলের বাহু স্পর্শ করে সহাস্যে বললেন, আর্যপুত্র, আপনার এ প্রকার কথা শুনে আমি অভিমান করব না। আমি বুঝে গেছি, অতি প্রণয় বলেই আপনি এ রকম আচরণ করেন। আপনার যে এত ঈর্ষা, আমার মুখে অন্য পুরুষের নাম উচ্চারণ কিংবা অন্য পুরুষের মুখে আমার নাম উচ্চারণ পর্যন্ত যে আপনি সইতে পারেন না তার কারণ আপনি আমাকে খুব বেশী ভালবাসেন! শেষ পর্যন্ত আপনি ভাবলেন কিনা আমি পুষ্করের আসক্ত? হায়-হায়-হায় হায়। আর্যপুত্র, আমি হাস্য সংবরণ করতে পারছি না!

ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে রাজা নল বললেন, দময়ন্তী, তোমার সম্পর্কে এমন অযথা সন্দেহ করা আমার অনুচিত হয়েছে। তুমি ঠিকই বলেছ, আমি বেশী বেশী ঈর্ষাপরায়ণ। দেখ, তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ এত বেশী যে আমি জীবনে আর অন্য কোন নারীর দিকে ভাল ভাবে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করি না। সেই জন্যই অন্য কেউ তোমাকে মনে মনে কামনা করছে, জানতে পারলেও আমার সহ্য হয় না।

দময়ন্তী বলল, হে কীর্তিমান, আমি আর একটা কথা বলি। শুধু ভালবাসা মানুষকে যন্ত্রণা দেয়। তার সঙ্গে স্নেহ দয়ামায়া ক্ষমাগুণ মেলাতে হয়। আমাদের এত আনন্দের দিনে কেন রক্তপাতের মতন অমঙ্গলজনক কাজ করবেন? সেইজন্যই আমি পুষ্করের মুক্তি চেয়েছি।

নল বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। পুষ্করের শুধু মুক্তি নয়, তাকে রাজ্যের একটি অংশও দান করলাম।

দময়ন্তী বললেন, আমাদের পরস্পরের হৃদয়েই তো আমরা আছি, আমাদের আর বাইরের দিকে তাকাবার দরকার কী? ভালবাসা তো হৃদয়েই আবদ্ধ।

নল বললেন, তথাস্তু! আজ থেকে আমি অন্তর্মুখী হলাম। প্রণয় থেকে ঈর্ষা দ্বেষ বিযুক্ত করে আমরা যেন মহত্তর লোকে উঠে যেতে পারি।

তারপর দুজনে দুজনের মুখের দিকে অপলক ভাবে চেয়ে রইলেন।

